১৮১৮ সালের ৫ই মে প্রুশিয়ার রাইন অঞ্চলের ত্রিয়ার শহরে স্বচ্ছল ও সংস্কৃতিবান, কিন্তু বিপ্লবী নয় এমন এক পরিবারে কার্ল মার্কসের জন্ম হয়। মতামতের দিক থেকে মার্কস প্রথমে ছিলেন বাম হেগেলপন্থী, তারপর ফয়েরবাখপন্থী। তিনি ও তাঁর বন্ধু এঙ্গেলস হেগেলের ভাববাদ বর্জন করে দ্বন্দ্ববাদ গ্রহণ করেন, আর ফয়েরবাখের অন্দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ থেকে বস্তুবাদ গ্রহণ করেন। বিপ্লবী চিন্তা ও কর্মের কারণে তাঁর অধ্যাপক হওয়া হয়না, প্রধান প্রধান যেসব পত্রিকায় কাজ করতেন সেসব নিষিদ্ধ হয়, দেশ থেকে তিনি বিতাড়িত হন। জার্মান, ফ্রান্স, বেলজিয়াম থেকে নির্বাসিত হতে হতে শেষে লন্ডনে নির্বাসিত হন। নির্বাসিত জীবন তার অনেক কষ্টে কাঁটে। বন্ধু এঙ্গেলস তাঁর পরিবারকে বেঁচে থাকতে সহযোগিতা করেন। ১৮৪৩ সালে ক্রয়েজনাখ শহরে মার্কস জেনি ফন ভেস্তফেলেনকে বিবাহ করেন। ১৮৪৪ সালের সেপ্টেম্বরের ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস কয়েক দিনের জন্য প্যারিসে আসেন আর তখন থেকে মার্কসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেন। উভয়েই তাঁরা প্যারিসের সেসময়ের বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির টগবগে জীবনে অত্যন্ত উদ্দীপ্ত অংশ নেন এবং ক্ষুদে বুর্শোয়া সমাজতন্ত্রের নানাবিধ মতবাদের সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে বিপ্লবী সর্বহারা সমাজতন্ত্র অথবা সাম্যবাদের (মার্কসবাদের) তত্ত্ব ও রণকৌশল গড়ে তোলেন। প্রুশীয় সরকারের দাবিতে ১৮৪৫ সালে বিপজ্জনক বিপ্লবী বলে মার্কসকে প্যারিস থেকে বহিষ্কার করা হয়। মার্কস ব্রাসেলসে আসেন। ১৮৪৭ সালের বসন্তে তিনি ও এঙ্গেলস 'সাম্যবাদী লীগ' নামে একটি গোপন প্রচার সমিতিতে যোগ দেন। ১৮৪৭ সালের নভেম্বরে লন্ডনে অনুষ্ঠিত লীগের দ্বিতীয় কংগ্রেসে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং কংগ্রেস থেকে ভার পেয়ে তাঁরা সুবিখ্যাত *সাম্যবাদী পার্টির ইশতেহার* রচনা করেন, ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে তা প্রকাশিত হয়। প্রতিভাদীপ্ত স্পষ্টতা ও উজ্জ্বলতায় এই রচনাটিতে রূপায়িত হয়েছে নতুন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীঃ সুসঙ্গত বস্তুবাদ যা সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, বিকাশের সবচেয়ে সামগ্রিক ও সুগভীর মতবাদ দ্বন্দ্ববাদ, শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব এবং নতুন সাম্যবাদী সমাজের স্রষ্টা সর্বহারা শ্রেণীর বিশ্ব ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকার তত্ত্ব। পঞ্চম দশকের শেষে ও ষষ্ঠ দশকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনের কাল মার্কসকে আবারো ব্যবহারিক কার্যকলাপের মধ্যে ডাক দেয়। ১৮৬৪ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর লন্ডনে বিখ্যাত প্রথম আন্তর্জাতিক 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ'-এর প্রতিষ্ঠা হয়। মার্কস ছিলেন এই সমিতির প্রাণস্বরূপ, এর প্রথম অভিভাষণ, বহুবিধ প্রস্তাব, ঘোষণা ও ইশতেহার তাঁরই লেখা। বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করে, বিভিন্ন ধরণের প্রাক-মার্কসীয় অসর্বহারা সমাজতন্ত্রকে যেমন মাৎসিনি, প্রুধোঁ, বাকুনিন, ইংল্যান্ডের উদারনীতিক ট্রেড ইউনিয়নবাদ, জার্মানিতে লাসালপন্থীদের ডানপন্থী দোদুল্যমানতা ইত্যাদিকে সংযুক্ত কার্যকলাপের পথে চালনার চেষ্টা করেন এবং এই সব সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগুলির মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে চালাতে মার্কস বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সর্বহারা সংগ্রামের একটি সুষম রণকৌশল গড়ে তোলেন। প্যারিস কমিউনের সুগভীর, পরিষ্কার, চমৎকার, কার্যকরী, বিপ্লবী মূল্যায়ন মার্কস উপস্থিত করেন। মার্কস দেখান যে সর্বহারা শ্রেণী তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রের দখল পেয়েই তা কাজে লাগাতে পারেনা, তাকে ধ্বংস করতে হবে, সেখানে বসাতে হবে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র। ১৮৭১ সালে প্যারির পতন ও বাকুনিনপন্থীগণ কর্তৃক প্রথম আন্তর্জাতিকের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পর ইউরোপে সংগঠনটির অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে পড়ল। আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেস ১৮৭২-এর পর মার্কস আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদকে নিউইয়র্কে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন। প্রথম আন্তর্জাতিক তার ঐতিহাসিক ভূমিকা সমাপ্ত করে। পৃথিবীর সমস্ত দেশে শ্রমিক আন্দোলনের অপরিসীম বৃদ্ধির একটা যুগ, তার প্রসারব্যপ্তি আর ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক গণ শ্রমিক পার্টি সৃষ্টির একটা যুগের জন্যই তা পথ ছেড়ে দেয়। আন্তর্জাতিকে কঠিন পরিশ্রম এবং তত্ত্বগত কাজের জন্যে কঠিনতর শ্রম দেয়ার ফলে মার্কসের স্বাস্থ্য চূড়ান্তরূপে ভেঙে গিয়েছিল। রাজনৈতিক অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানো এবং *পুঁজি* বইটিকে সম্পূর্ণ করার কাজ তিনি চালিয়ে যান, রাশি রাশি নতুন তথ্য সংগ্রহ করে ও বেশ কিছু ভাষা, যেমন রুশ আয়ত্ত করেন, কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যে *পুঁজি* বইখানি সম্পূর্ণ করা তাঁর হয়ে উঠলনা। ১৮৮১ সালের ২রা ডিসেম্বর তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ১৮৮৩ সালের ১৪ই মার্চ আরাম কেদারায় বসে শান্তভাবে মার্কস তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। লন্ডনের হাইগেট সমাধিক্ষেত্রে মার্কসকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সমাধিস্থ করা হয়। মার্কসের সন্তানদের মধ্যে কিছু শৈশবেই মারা যায় লন্ডনে, যখন চরম অভাবের মধ্যে পরিবারটি বাস করছিল। এলেওনেরা আভেলিং, লরা লাফার্গ ও জেনি লঁগে—মেয়েদের এই তিনজনের বিয়ে হয় ইংরেজ ও ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে। শেষোক্ত জনের পুত্র ফরাসী সমাজ গণতন্ত্রী পার্টির একজন সদস্য।।

ভ ই লেনিন

কার্ল মার্কস

মার্কসবাদের প্রতিপাদ্যসহ

মার্কসের জীবনী

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন

কার্ল মার্কস। মার্কসবাদের প্রতিপাদ্যসহ মার্কসের জীবনী।

রচনাঃ ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন

লেনিন তার প্রবন্ধ "কার্ল মার্কস" লিখতে শুরু করেন রুশ ডালিম বিশ্বকোষে প্রকাশের জন্য পরনিন (গ্যালিসিয়া)তে ১৯১৪ সালের বসন্তে আর শেষ করেন সুইজারল্যান্ডের বার্নে একই বছরের নভেম্বরে। ১৯১৮ সালে পুস্তিকা আকারে প্রকাশনায় লেনিন বলেন লেখাটি ১৯১৩ সালে লিখিত হয়েছে। ভ ইলিন নামে সাক্ষরিত হয়ে বিশ্বকোষে ১৯১৫ সালের প্রকাশিত সংস্করণটিতে "মার্কসবাদের গ্রন্থপঞ্জী" সংযুক্তি ছিল। সেন্সর আরোপিত হওয়ায় বিশ্বকোষের সম্পাদকগণ "সমাজতন্ত্র" ও সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামের রণকৌশল" এই দুটি অধ্যায় বাদ দেয়, আর পাঠে বেশ কিছু সংশোধনী আনে। ১৯১৮ সালে প্রিবই প্রকাশনী মূল প্রবন্ধটি একটি পৃথক পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে (বিশ্বকোষে ঠিক যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল) বিশেষত লেনিন লিখিত ভূমিকাসহকারে, "মার্কসবাদের গ্রন্থপঞ্জী" সংযুক্তি বাদ দিয়ে। প্রবন্ধটি পুরোপুরিভাবে পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী প্রকাশিত হয় রুশ সাম্যবাদী পার্টি (বলশেভিক) এর কেন্দ্রীয় কমিটির লেনিন ইন্সটিটিউট কর্তৃক মার্কস, এঙ্গেলস, মার্কসবাদ সংগ্রহতে।

মূল রুশ রচনাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্যবাদী পার্টির মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইন্সটিটিউট কর্তৃক ভ ই লেনিন সংগৃহীত রচনাবলী ২৬শ খন্ড, পৃঃ ৪৩—৮১তে। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত ইংরেজী সংগৃহীত রচনাবলী থেকে চীনের বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয় পিকিঙ ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সালে এই রচনাটির ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রগতি প্রকাশনী ১৯৭১ সালে রচনাটির ৫ম রুশ সংস্করণ থেকে বাংলায় ভাষান্তর করে প্রকাশ করে। সিপিএমএলএম বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় অধ্যয়ন গ্রুপ উক্ত বাংলা সংস্করণটিতে অনুবাদের কিছু সংশোধন ও ভাষাগত পরিমার্জন সাধন করে ২রা মার্চ, ২০২৪ প্রকাশ করে। এর জন্য বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয় পিকিঙ রক্ষিত ইংরেজী ভাষান্তরের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। সর্বহারা পথ ওয়েবসাইট থেকে নতুন সংস্করণটি পড়া ও প্রিন্ট নেয়া যাবে।

বাংলা ভাষান্তরের ভূমিকা

রচনাটির বাংলা ভূমিকায় কিছুটা সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

লেনিন কার্ল মার্কসের যে জীবনী রচনা করেছেন তার মাধ্যমেই আমরা সঠিকভাবে মার্কসের জীবন সম্পর্কে জানতে পারি। এছাড়া তিনি মার্কসবাদের মূল সূত্রসমূহ তুলে ধরেছেন। এখানে কার্ল মার্কসের জীবন বলতে আমরা বুঝি এক বিপ্লবী জীবন।

মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গী ও শিক্ষামালার নাম *মার্কসবাদ*। ধ্রুপদী জার্মান দর্শন, ধ্রুপদী ইংরেজী রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং ফরাসী সমাজতন্ত্র তথা সাধারণভাবে ফরাসী বিপ্লবী মতবাদ—মানবজাতির সবচেয়ে অগ্রসর তিনটি দেশে আবির্ভূত উনিশ শতকের এই তিনটি প্রধান মতাদর্শগত ধারার ধারাবাহক ও প্রতিভাধর পূর্ণতাসাধক হলেন মার্কস।

মার্কস বলেনঃ সকল অধিবিধ্যা হল "সংযত দর্শনচিন্তার' বদলে 'মাতাল কল্পানুমান" আর "হেগেলের কাছে চিন্তার প্রক্রিয়া হল বাস্তব জগতের স্রষ্টা, নির্মাতা। এই প্রক্রিয়াকে তিনি ভাব আখ্যা দিয়ে একটি স্বাধীন কর্তায় পর্যন্ত পরিণত করেছিলেন... উল্টোদিকে, ভাব আমার কাছে মানব মনে প্রতিফলিত ও সেখানে রূপান্তরিত বাস্তব ছাড়া কিছু নয়"। মার্কসের এই বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে তারই বিবরণ দেন ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসঃ "বিশ্বজগতের ঐক্য তার অস্তিত্বে নয়, তার বস্তুময়তায় ... দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য অগ্রগতির মধ্য থেকে তার প্রমাণ মিলবে"... "*গতিই হল বস্তুর অস্তিত্বের রূপ।* গতিহীন বস্তু অথবা বস্তুবিচ্ছিন্ন গতি কোথাও কখনো ছিলনা, থাকতেও পারেনা ... গতিহীন বস্তু বস্তুহীন গতির মতই অবাস্তব"। "যদি প্রশ্ন করা যায়... ভাবনা ও চেতনা কী জিনিস, কোথা থেকেই বা তারা এল, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে মানুষের মস্তিষ্ক থেকে তাদের সৃষ্টি আর খোদ মানুষেরও সৃষ্টি প্রকৃতি জগত থেকে, একটা নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই সে বিকাশমান। এ থেকে এটা স্বতসিদ্ধ যে মানব মস্তিষ্কের সৃষ্টি চূড়ান্ত বিবেচনায় প্রকৃতিরই সৃষ্টি হওয়ায় তা অবশিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পর্কগুলির বিরোধী নয়, বরং সামঞ্জস্যপূর্ণ"। 'ল্যুদভিগ ফয়েরবাখ' বইখানিতে এঙ্গেলস তাঁর ও মার্কসের বক্তব্য লিখেছেনঃ

"সমস্ত দর্শনের, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক দর্শনচিন্তার বিরাট বনিয়াদী প্রশ্ন হল অস্তিত্বের সঙ্গে চিন্তার, প্রকৃতির সঙ্গে মনের সম্পর্ক বিষয়ক প্রশ্ন... কোনটা কার আগেঃ মনের আগে প্রকৃতি না প্রকৃতির আগে মন... এই প্রশ্নের উত্তর যে যেমন দিয়েছেন সেই অনুসারে দার্শনিকেরা দুইটি বৃহৎ শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। যাঁরা প্রকৃতির আগেই মনের অস্তিত্ব ঘোষণা এবং সেই কারনে শেষ পর্যন্ত কোন না কোনভাবে বিশ্ব সৃষ্টির প্রকল্প মেনেছেন... তাঁরা হলেন ভাববাদী শিবির। যাঁরা প্রকৃতিকেই আদি বলে ধরেছেন তাঁরা হলেন বিভিন্ন গোষ্ঠীর বস্তুবাদী"। আবশ্যিকতার সঙ্গে স্বাধীনতার সম্পর্ক বিষয়ে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্যঃ "প্রয়োজনের উপলব্ধিই হল স্বাধীনতা"। এঙ্গেলস বলেন,*"আবশ্যকতার উপলব্ধি না থাকলেই তা অন্ধ"* । এর অর্থ হল প্রকৃতির বস্তুগত নিয়মবদ্ধতা এবং স্বাধীনতার আবশ্যিকতায় দ্বান্দ্বিক রূপান্তর স্বীকার করা, ঠিক যেভাবে অজ্ঞাত কিন্তু জ্ঞেয় 'নিজের ভেতর নিজে বস্তু' পরিবর্তিত হয় 'আমাদের জন্য বস্তুতে', 'বস্তুর মর্মসার' পরিবর্তিত হয় 'ঘটনায়'। মার্কসবাদী বস্তুবাদ অনুসারে, এ জগতকে ব্যাখ্যা করাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন এ জগতকে পরিবর্তন করা। তাই, মাও সেতুঙ বলেছেন, স্বাধীনতা শুধু প্রয়োজনের উপলব্ধিই নয়, তার রূপান্তরও। আর এই রূপান্তরই প্রধান।

বিকাশ প্রায়শই উলম্ফন, বিপর্যয় ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ঘটে। ফ এঙ্গেলস বলেনঃ "বলা চলে প্রায় একমাত্র মার্কস এবং আমি" হেগেলবাদসমেত ভাববাদের ধ্বংসস্তুপ থেকে "সচেতন দ্বন্দ্ববাদকে উদ্ধার করতে" "এবং প্রকৃতিজগতের বস্তুবাদী ধারণার ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছি"। "দ্বন্দ্ববাদের সমর্থনক্ষেত্র হল প্রকৃতি, এবং ঠিক আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকেই দেখা যাচ্ছে যে এ সমর্থন আসাধারণ সমৃদ্ধ", "যার মধ্যে দিন দিন সঞ্চিত হয়ে উঠছে রাশি রাশি মালমসলা ও তা প্রমাণিত করছে যে চূড়ান্ত বিচারে প্রকৃতি দ্বান্দ্বিকভাবে কাজ করে, অধিবিদ্যকভাবে নয়"। এ কথা লেখা হয়েছিল রেডিয়াম, ইলেক্ট্রন, মৌলিক পদার্থের রূপান্তর প্রভৃতি আবিষ্কারের বহু আগেই! এঙ্গেলস লিখেছেন, "আগে থেকে তৈরি *কতগুলি বস্তু* দিয়ে এ বিশ্ব গড়া নয়, এ বিশ্ব হল *প্রক্রিয়াসমূহের* সামগ্রিকতা, যেখানে আপাত স্থির বস্তু, আমাদের মস্তিষ্কে তাদের মানসপ্রতিচ্ছবি, ধ্যানধারণা চলেছে এক অবিরাম পরিবর্তন স্রোতের মধ্য দিয়ে,

কখনো উদ্ভূত হচ্ছে, কখনো ধ্বংস হচ্ছে।..."। বিকাশের ধারণা, বিবর্তনের ধারণার উপর মার্কস ও এঙ্গেলস যেভাবে তার সূত্র দিয়েছেন সে আকারে এটা বিবর্তনের প্রচলিত ধ্যান ধারণার চেয়ে অনেক বেশি সামগ্রিক ও অনেক বেশি সারগর্ভ। অতিক্রান্ত স্তরের পুনরাবর্তনের মত বিকাশ, কিন্তু পুনরাবর্তন অন্য একটা উচ্চতর ভিত্তিতেঃ "নেতিকরণের নেতিকরণ"; সরল রেখায় বিকাশ নয়, বলা যেতে পারে সর্পিল আকারে বিকাশ; উলম্ফন, বিপর্যয়, বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে বিকাশ; "ক্রমিকতায় ছেদ", পরিমাণের গুণে রূপান্তর, একটি বস্তুর ওপর, অথবা নির্দিষ্ট ঘটনার পরিসীমার মধ্যে কিংবা একটি সমাজের অভ্যন্তরে সক্রিয় বিভিন্ন শক্তি ও প্রবণতার বিরোধ থেকে, সংঘাত থেকে পাওয়া বিকাশের আভ্যন্তরীণ তাড়না; প্রত্যেকটি ঘটনার *সবকটি* দিকের পম্পরনির্ভরতা এবং সুনিবিড় অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, সেই সঙ্গে আবার ইতিহাস কর্তৃক অনবরত নতুন নতুন দিকের উদ্ঘাটন, এমন সম্পর্ক যা থেকে গতির একক নিয়মানুগ সার্বজনীন প্রক্রিয়ার উদ্ভব, এগুলো হল সচরাচরের তুলনায় বিকাশের আরো সারগর্ভ মতবাদস্বরূপ দ্বন্দ্ববাদের দিকসমূহ। পরবর্তীতে মাও সেতুঙ দ্বন্দ্ববাদের এই ত্রয়ী নিয়মকে একটি নিয়ম হিসেবে উল্লেখ করেছেন "বিপরীতের ঐক্য ও সংগ্রাম"। তিনি পরিমাণের গুণে রূপান্তরকে পরিমাণ ও গুণের ঐক্য ও সংগ্রাম হিসেবে দেখেছেন। আর বলেছেন, নেতিকরণের নেতিকরণ নিয়ম হিসেবে অস্তিত্বমান নয়।

মানব সমাজ ও মানব ইতিহাসের ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রযুক্ত বস্তুবাদের মূলনীতির সামগ্রিক সূত্র মার্কস তাঁর *রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে* পুস্তকের ভূমিকায় এইভাবে দিয়েছেনঃ

"নিজেদের জীবনের সামাজিক উৎপাদনে মানুষ এমন কতগুলি সুনির্দিষ্ট অপরিহার্য সম্পর্কের মধ্যে, যেমন উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে, যা তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরে, যা বস্তুগত উৎপাদন শক্তির বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরটির পক্ষেই উপযোগী।

"এইসব উৎপাদন সম্পর্কের সমষ্টি থেকেই গড়ে উঠে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, বাস্তব ভিত্তি, এই বাস্তব ভিত্তির উপরেই দাড়া হয় আইনী ও রাজনৈতিক উপরিকাঠামো এবং তারই উপযোগী হয়ে দেখা দেয় সামাজিক চেতনার নির্দিষ্ট রূপগুলি।

বস্তুগত জীবনের উৎপাদন পদ্ধতি থেকেই নির্দিষ্ট হয় সাধারণভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও মননবিষয়ক জীবনধারা। মানুষের চেতনা তার অস্তিত্ব নির্ধারন করেনা, বরং মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনাকে নির্ধারন করে। বিকাশের এক একটা বিশেষ স্তরে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে বিরোধ বাধে সমাজের বস্তুগত উৎপাদন শক্তির, অথবা, ওই একই কথাকে আইনের পরিভাষায় বললে দাঁড়ায়, যে সম্পত্তি মালিকানা সম্পর্কের মধ্যে এই সব উৎপাদন শক্তি এযাবত বিকশিত হচ্ছিল বিরোধ ঘটে তারই সাথে। উৎপাদন শক্তি বিকাশের একটা পর্যায়ে এলে এই সম্পর্ক পরিণত হয় তার শৃঙ্খলে। তখন আরম্ভ হয় সামাজিক বিপ্লবের যুগ।

সাম্যবাদী ইশতেহারে মার্কস লিখেছেন, "আদিম গোষ্ঠীসমাজের অবসানের পর থেকে আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখে গেছে তার ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস, স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্রাচীন রোমের অভিজাত মানুষ প্যাট্রিশিয়ান আর প্রাচীন রোমের সাধারণ মানুষ প্লিবিয়ান, জমিদার ও ভূমিদাস, মধ্যযুগের শিল্পসংঘ গিল্ড কর্তা ও কারিগর, এককথায় নিপীড়ক ও নিপীড়িতরা অব্যাহতভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, বিরতিহীনভাবে লড়াই চালিয়েছে কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে, যে লড়াই প্রতিবারই শেষ হয়েছে সমগ্র সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠণে অথবা দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলির সাধারণ ধ্বংসে। ইতিহাসের আগেকার যুগসমূহে আমরা প্রায় সর্বত্রই দেখি সমাজের নানা বর্গের জটিল বিন্যাস, সামাজিক পদ মর্যাদার বহুবিধ স্তর। প্রাচীন রোমে আমরা পাই প্যাট্রিশিয়ান, যোদ্ধা, প্লিবিয়ান, দাস; মধ্যযুগে সামন্ত প্রভু, জায়গিরদার, গিল্ড কর্তা, কারিগর, শিক্ষানবীশ কারিগর, ভূমিদাস প্রভৃতি; এসব প্রায় প্রতিটা শ্রেণীর মধ্যে আবার রয়েছে অধীন উপস্তরসমূহ।...সামন্ত সমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে যে বুর্শোয়া সমাজ জন্ম নিয়েছে তা শ্রেণী বৈরিতার অবসান ঘটায়নি। বরং তা প্রতিষ্ঠা করেছে নতুন শ্রেণীসমূহ, অত্যাচারের নতুন অবস্থা, পুরোনোটার জায়গায় সংগ্রামের নতুন ধরন। আমাদের যুগ, বুর্শোয়া যুগের রয়েছে এই এক বিশিষ্টতাঃ এটা শ্রেণী বৈরিতাকে সরল করেছে। সমাজ বেশি বেশি করে দুই শত্রু ভাবাপন্ন শিবিরে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, মুখোমুখি দাঁড়ানো দুই বিরাট শ্রেণীঃ বুর্শোয়া ও সর্বহারা"

মার্কসের তত্ত্বের সবচেয়ে সুগভীর, পূর্ণাঙ্গ ও বিশদ প্রমাণ তথা প্রয়োগ হল তাঁর অর্থনৈতিক মতবাদ।। ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট একটি বিশেষ সমাজের উৎপাদন সম্পর্কের উদ্ভব, বিকাশ ও পতনের অনুসন্ধান—এই হল মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদের বিষয়বস্তু।

পণ্য হল প্রথমত এমন একটি বস্তু যা দিয়ে মানুষের কোন একটা চাহিদা মেটে; দ্বিতীয়ত, এ হল এমন একটা বস্তু যার সঙ্গে অন্য বস্তুর বিনিময় চলে। বস্তুর উপযোগিতা থেকে তার ব্যবহার মূল্যের সৃষ্টি। বিনিময় মূল্য হল একটি সম্পর্ক, নির্দিষ্ট পরিমাণ এক ধরণের ব্যবহার মূল্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ অন্য ধরণের ব্যবহার মূল্য বিনিময়ের অনুপাত। সামাজিক সম্পর্কের একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থার ভেতর যেসব বিভিন্ন বস্তু প্রতিনিয়ত পরস্পর সমীকৃত হচ্ছে তাদের মধ্যে সাধারণ মিল এইখানে যে এরা সকলেই *শ্রমের ফল*। অর্থাৎ শ্রমের সমীকরণ করে। পণ্য উৎপাদন হল সামাজিক সম্পর্কের এমন একটা ব্যবস্থা যাতে ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদক ভিন্ন ভিন্ন বস্তু তৈরি করছে (সামাজিক শ্রমবিভাগ), এবং বিনিময়ের মধ্যে সেইসব বস্তুর পারস্পরিক সমীকরণ ঘটছে। সুতরাং সমস্ত পণ্যের মধ্যেই যে সাধারণ জিনিসটা রয়েছে সেটা কোন বিশেষ উৎপাদন শাখার প্রত্যক্ষ শ্রম নয়, নির্দিষ্ট এক ধরণের শ্রম নয়, বরং সেটা হল *বিমূর্ত* শ্রম, সাধারণভাবে মানুষের শ্রম। কোন নির্দিষ্ট সমাজের সমস্ত পণ্যের মোট মূল্যস্বরূপ মোট শ্রমশক্তি হল এই এক ও অভিন্ন মনুষ্য শ্রমশক্তিঃ কোটি কোটি বিনিময়ের ঘটানায় তার প্রমাণ মিলবে। সুতরাং নির্দিষ্ট প্রত্যেকটি পণ্যই হল *সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয়* শ্রম সময়ের এক একটা নির্দিষ্ট অংশ মাত্র। মূল্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয় সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ দিয়ে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট পণ্যটি, নির্দিষ্ট ব্যবহার মূল্যটির উৎপাদনে যেটুকু শ্রম সময় সামাজিকভাবে আবশ্যক, সেই শ্রম সময় দিয়ে। মার্কস বলেন, "মূল্য হিসাবে দেখলে পণ্য হল কেবল নির্দিষ্ট পরিমানের একটা ঘণীভূত শ্রম সময়"। পণ্যে নিহিত শ্রমের দ্বিবিধ চরিত্রের বিস্তারিত বিশ্লেষণের পর মার্কস *মূল্যের রূপ* ও *অর্থের* বিশ্লেষণ করেছেন। একটি পণ্য বিনিময় হচ্ছে আর একটি পণ্যের বিশেষ একটি পরিমাণের সঙ্গে, তা থেকে শুরু করে মূল্যের সার্বজনীন রূপ, যখন ভিন্ন ভিন্ন নানারকম পণ্যগুলিকে বিনিময় করা যায় বিশেষ একটি নির্দিষ্ট পণ্যের সঙ্গে,

এবং তা থেকে মূল্যের অর্থরূপ পর্যন্ত অধ্যয়ন, যখন সোনা হল সেই বিশেষ পণ্য, সার্বজনীন তুল্যমূল্য। বিনিময় ও পণ্য উৎপাদনের বিকাশের উচ্চতম ফল হল অর্থ; অর্থ ব্যক্তিগত শ্রমের সামাজিক চরিত্র ও বাজারের মারফত সংযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদকের সামাজিক সম্পর্ক ঢেকে গোপন করে রাখে।

উদ্বৃত্ত মূল্য।। পণ্য উৎপাদনের একটা বিশেষ স্তরে অর্থ রূপান্তরিত হয় পুঁজিতে। পণ্য সঞ্চালনের সূত্র ছিলঃ প—অ—প (পণ্য—অর্থ—পণ্য), অর্থাৎ একটি পণ্য ক্রয়ের জন্যে অন্য পণ্য বিক্রয়। পক্ষান্তরে পুঁজির সাধারণ সূত্র হলঃ অ—প—অ, অর্থাৎ বিক্রয়ের জন্য ক্রয় (মুনাফায়)। সঞ্চালনে ঢালা আদি অর্থ মূল্যের এই বৃদ্ধিটাকে মার্কস বলেছেন উদ্বৃত্ত মূল্য। ... এই 'বৃদ্ধিটাই' অর্থকে ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট বিশেষ একটি সামাজিক উৎপাদন সম্পর্ক হিসাবে *পুঁজিতে* পরিণত করে। পণ্য সঞ্চালন থেকে উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হতে পারেনা, কেননা পণ্য সঞ্চালনে শুধু সমতুল্য মূল্যেরই বিনিময় ঘটে থাকে; দর বাড়িয়ে দিলেও উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হতে পারেনা, কেননা ক্রেতা ও বিক্রেতাদের পারস্পরিক লাভ লোকসান কাটাকাটি হয়ে যাবে; অথচ এক্ষেত্রে প্রশ্নটা ব্যক্তিগত নয়, বরং গড়পড়তা, ব্যাপক ও সামাজিক একটা ঘটনা নিয়ে। উদ্বৃত্ত মূল্য পেতে হলে এমন একটি পণ্য মালিককে বের করতে হগে যাকে ভোগ করার প্রক্রিয়াই হল একইসাথে মূল্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া। তা হল মানুষের শ্রমশক্তি। তার ভোগ মানে শ্রম, আর শ্রমই মূল্য সৃষ্টি করে। অর্থের মালিক শ্রমশক্তিকে কেনে তার মূল্য দিয়ে, অন্যান্য পণ্যের মূল্যের মতই এ মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে তার উৎপাদনের জন্য সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম সময় থেকে (অর্থাৎ সপরিবারে শ্রমিকের ভরণপোষণের খরচ থেকে)। শ্রমশক্তি ক্রয় করার পর অর্থের মালিক তা ভোগ করার, অর্থাৎ সারাদিনের জন্য ধরা যাক বারো ঘন্টার জন্য, তাকে খাটাবার অধিকার অর্জন করে। অথচ নিজের ভরণপোষণের খরচা তোলার মত উৎপাদন শ্রমিক তৈরি করছে ছয় ঘন্টার মধ্যেই ('প্রয়োজনীয়' শ্রমসময়) এবং ছয় ঘন্টায় ('উদ্বৃত্ত' শ্রমসময়) সে তৈরি করছে 'উদ্বৃত্ত' উৎপাদন, অথবা উদ্বৃত্ত মূল্য, যার জন্য পুঁজিপতি কোন দাম দেয়নি। অতএব, উৎপাদন প্রক্রিয়ার দিক থেকে দেখলে, পুঁজিকে দুভাগে ভাগ করে দেখতে হবেঃ স্থির পুঁজি, যা ব্যয় হচ্ছে উৎপাদনের উপায়সমূহের পেছনে (যন্ত্রপাতি, শ্রমের হাতিয়ার, কাঁচামাল ইত্যাদি),

এ পুঁজির মূল্যে কোন বদল না হয়ে তা সম্পূর্ণরূপে (একসঙ্গে অথবা ভাগে ভাগে) উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে এসে জমা হয়; এবং পরিবর্তনশীল পুঁজি, যা ব্যয় হয় শ্রমশক্তির জন্য। শেষোক্ত পুঁজির মূল্য অপরিবর্তনীয় থাকেনা, শ্রমপ্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে তা বাড়ে এবং সৃষ্টি করে উদ্বৃত্ত মূল্য। সুতরাং পুঁজি কর্তৃক শ্রমশক্তি শোষণের মাত্রা প্রকাশ করতে হলে উদ্বৃত্ত মূল্যের সঙ্গে পুরো পুঁজির তুলনা না করে তুলনা করতে হবে কেবল পরিবর্তনশীল পুঁজির। এ হিসেবে, পূর্বোক্ত উদাহারণে এই অনুপাত, মার্কস যার নাম দিয়েছেন উদ্বৃত্ত মূল্যের হার, হবে ৬-৬, অর্থাৎ শতকরা ১০০ ভাগ।

পুঁজি সৃষ্টির ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত হয়, প্রথমত, সাধারণভাবে পণ্য উৎপাদনের তুলনামূলক উচ্চস্তরে ব্যক্তি বিশেষের হাতে কিছু পরিমাণ অর্থ সঞ্চয়, এবং দ্বিতীয়ত, এমন শ্রমিকের অস্তিত্ব যে উভয় অর্থে 'মুক্ত': শ্রমশক্তি বিক্রয়ের পথে সবরকমের বাধা, বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত এবং জমি ও সাধারণভাবে উৎপাদনের সকল উপায় থেকেও মুক্ত, কোন প্রভুর সাথে বাঁধা নয়, সে হল 'সর্বহারা', নিজ শ্রমশক্তি বিক্রী ছাড়া যার জীবিকানির্বাহের উপায় নেই।

উদ্বৃত্ত মূল্য বাড়িয়ে তোলার দুটি প্রধান পদ্ধতি আছেঃ শ্রমদিনের দৈর্ঘ্য বাড়ানো (অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য) অথবা প্রয়োজনীয় শ্রমসময় কমানো (আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য)।

আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্যের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মার্কস তিনটি প্রধান ঐতিহাসিক পর্যায়ের আলোচনা করেছেন, যার ভেতর দিয়ে পুঁজিবাদ শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়েছেঃ ১। সরল সমবায় ২। শ্রমবিভাগ ও হস্তশিল্প কারখানা ৩। যন্ত্রপাতি ও বৃহদাকার শিল্প।

পুঁজির সঞ্চয়, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা অংশের পুঁজিতে রূপান্তর, পুঁজিপতির ব্যক্তিগত প্রয়োজন অথবা খেয়ালখুশি মেটাবার জন্যে ব্যবহার না করে নতুন উৎপাদনের জন্যে তার ব্যবহার, এই বিষয়ে মার্কসের বিশ্লেষণ অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অভিনব। এডাম স্মিথ থেকে শুরু করে আগেকার সমস্ত ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতি যে মনে করত যে পুঁজিতে রূপান্তরিত উদ্বৃত্ত মূল্যের সবখানিই যায় পরিবর্তনশীল পুঁজিতে, মার্কস তার ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে সেটা *উৎপাদনের উপায়* এবং পরিবর্তনশীল পুঁজি এই দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। মোট পুঁজির ভেতরে পরিবর্তনশীল পুঁজির অংশটার

তুলনায় স্থির পুঁজির অংশটার দ্রুততর বৃদ্ধি পুঁজিবাদের বিকাশ প্রক্রিয়া এবং সমাজতন্ত্রে তার রূপান্তরের পক্ষে অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ।

পুঁজির সঞ্চয় শ্রমিকের বদলে যন্ত্র নিয়োগ করার গতিকে ত্বরান্বিত করে, এক প্রান্তে ধনসম্পদ আর অন্য প্রান্তে দারিদ্র্য সৃষ্টি করে, গড়ে তোলে তথাকথিত 'শ্রমের মজুত বাহিনী', শ্রমিকদের 'আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত', অথবা 'পুঁজিবাদী অতি জনসংখ্যা', যা বিভিন্ন বিচিত্র রূপে প্রকাশ পায় এবং পুঁজিকে অসাধারণ দ্রুত হারে উৎপদনের প্রসার ঘটাবার সুযোগ করে দেয়। প্রসঙ্গত, এই সম্ভাবনা এবং সেই সঙ্গে ক্রেডিট (জমা) ও উৎপাদনের উপায়রূপে পুঁজির যে সঞ্চয়—তা থেকে অতি উৎপাদন সংকট বোঝার সূত্র পাওয়া যাবে, যা পুঁজিবাদী দেশে প্রথমে দেখা দিত পর্যায়ক্রমে গড়ে প্রতি দশ বছর অন্তর, এবং পরে ঘটছে আরো দীর্ঘ সময় ধরে ও কম সুনির্দিষ্ট ব্যবধানে। পুঁজিবাদের ভিত্তিতে পুঁজির যে সঞ্চয় তা থেকে আলাদা করে দেখতে হবে তথাকথিত আদি সঞ্চয়ঃ উৎপাদনের উপায় থেকে জোর করে শ্রমিকের বিচ্ছেদ, জমি থেকে কৃষককে বিতাড়ন, গ্রামগোষ্ঠীর জমি চুরি, উপনিবেশ ব্যবস্থা, জাতীয় ঋণ, সংরক্ষণ শুল্ক ইত্যাদি। 'আদি সঞ্চয়' থেকে সৃষ্টি হয় এক প্রান্তে 'মুক্ত' সর্বহারা আর অন্য প্রান্তে টাকার মালিক পুঁজিপতির।

*'পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের ঐতিহাসিক প্রবণতা'*য় মার্কস নিম্নলিখিত সুবিখ্যাত কথায় বর্ণনা করেছেনঃ 'সাক্ষাত উৎপাদকদের উচ্ছেদ কার্য সম্পন্ন করা হয় নৃশংসতম বর্বরতার মধ্য দিয়ে এবং জঘন্যতম, কদর্যতম, তুচ্ছ ও ঘৃণ্যতম প্রবৃত্তির তাড়নায়। 'মালিকের' (কৃষক ও হস্তশিল্পীদের) "শ্রমোপার্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আলাদা আলাদা স্বাধীন মেহনতকারীদের সঙ্গে তাদের শ্রমের হাতিয়ার ও উপায়সমূহের বলা যায় একীভূতকরণের ওপর ভিত্তি করে যা গড়ে উঠেছিল, তার স্থান গ্রহণ করে পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি, নামেই স্বাধীন, অন্যের শ্রমের শোষণের উপর যার ভিত্তি।... এবার স্বাধীন শ্রমিক যে নিজের জন্য কাজ করছে তাদেরকে নয়, বহু শ্রমিকদের শোষণ করছে এমন পুঁজিপতিদেরই উচ্ছেদ করার পালা। এ উচ্ছেদ সম্পন্ন হয় পুঁজিবাদী উৎপাদনের অন্তর্নিহিত নিয়মগুলির ক্রিয়া অনুসারেই, পুঁজির কেন্দ্রীভবনের মধ্য দিয়ে।

অনেক পুঁজিপতিকে ঘায়েল করে একজন পুঁজিপতি। ...এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার সব সুবিধা যারা বেদখল করছে, একচেটিয়া করে নিচ্ছে, পুঁজির সেইসব রাঘব বোয়ালদের সংখ্যা ক্রমাগত কমার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে দারিদ্র্য, নিপীড়ন, দাসত্ব, অধপতন ও শোষণের ব্যাপকতা; কিন্তু তার সঙ্গেই বাড়তে থাকে শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্রোহ, পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যারা সংখ্যায় অব্যাহতভাবে বাড়ছে আর শিক্ষিত, ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হয়ে উঠছে। পুঁজির একচেটিয়া অধিকার সেই উৎপাদন পদ্ধতির পথেই একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায় যা তার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিয়েছে আর তার অধীনেই বেড়ে উঠেছে। উৎপাদন উপায়ের কেন্দ্রীভবন এবং শ্রমের সামাজীকরণ শেষ পর্যন্ত এমন একটা মাত্রায় গিয়ে পৌঁছে যখন তার সঙ্গে আর পুঁজিবাদী খোসাটা খাপ খায়না। খোসা ফেঁটে যায়। পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানার মৃত্যুঘন্টা বাজে। উচ্ছেদ করা হয় উচ্ছেদকারীদের" (পুঁজি, প্রথম খণ্ড)।

মোট সামাজিক পুঁজির পুনরুৎপাদন বিষয়ে পুঁজি, দ্বিতীয় খন্ডেও মার্কস একক ঘটনা না নিয়ে ব্যাপক ঘটনা নেন, সমাজের অর্থনীতির একটা ভগ্নাংশ না নিয়ে সমগ্রভাবে পুরো অর্থনীতিটাকেই বিচার করেন। পূর্বোক্ত ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের ভ্রান্তি সংশোধন করে মার্কস সমগ্র সামাজিক উৎপাদনকে ভাগ করেছেন দুটি প্রধান ভাগেঃ ১। উৎপাদনের উপায়ের উৎপাদন ২। ভোগ্য বস্তুর উৎপাদন।

পুঁজি বইটির তৃতীয় খণ্ডে *মুনাফার গড় হার* সৃষ্টির সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে মূল্যের নিয়মকে ভিত্তি করে। অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্কস যে বিরাট অগ্রগতি ঘটিয়েছেন সেটা এইখানে যে, স্থূল রাজনৈতিক অর্থনীতি অথবা সাম্প্রতিক 'প্রান্তিক উপযোগিতার তত্ত্ব' যেভাবে বিচ্ছিন্ন ঘটনা অথবা প্রতিযোগিতার বাহ্যিক অগভীর দিকগুলিতে প্রায়শই সীমাবদ্ধ থাকে, মার্কস সেরকম কোন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ না করে তাঁর বিশ্লেষণ চালিয়েছেন ব্যাপক অর্থনৈতিক ঘটনার দৃষ্টিকোণ থেকে, সামাজিক অর্থনীতির সামগ্রিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে। মার্কস প্রথমে বিশ্লেষণ করেছেন কীভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হয় এবং তারপরে পর্যালোচনা করেছেন উদ্বৃত্ত মূল্য কীভাবে মুনাফা, সুদ ও ভুমি-খাজনায় ভাগ হয়ে যায়। মুনাফা হল উদ্বৃত্ত মূল্য ও কারবারে নিয়োযিত মোট পুঁজির অনুপাত।

যে পুঁজির 'আঙ্গিক গঠন উঁচু' (অর্থাৎ পরিবর্তনশীল পুঁজির তুলনায় স্থির পুঁজির পরিমাণ যেখানে সামাজিক গড়পড়তা অনুপাতের চেয়ে বেশি) তার মুনাফার হার গড়পড়তা হারের চেয়ে কম; যে পুঁজির 'আঙ্গিক গঠন নিচু' তার মুনাফার হার গড়পড়তা হারের চেয়ে বেশি। বিভিন্ন ধরণের পুঁজির মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং এক শাখা থেকে অন্য শাখায় পুঁজির স্বাধীন চলাচলের ফলে উভয়ক্ষেত্রেই মুনাফার হার গড় হারের দিকে যায়। কোন একটি সমাজের সমস্ত পণ্যের মোট মুল্যের সঙ্গে সমস্ত পণ্যের মোট দাম মিলে যায়। কিন্তু প্রতিযোগিতার দরুন ভিন্ন ভিন্ন কারবারে এবং উৎপাদনের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় পণ্য তাদের যথাযথ মূল্যে বিক্রয় হয়না, বিক্রয় হয় উৎপাদনের দাম (অথবা উৎপাদনী দাম) অনুসারে। এটা হল ব্যয়িত পুঁজির সঙ্গে গড় মুনাফার যোগফল।

মূল্যের নিয়মকে ভিত্তি করে এইভাবে মার্কস মূল্য থেকে দামের বিচ্যুতি এবং মুনাফার সমতা বিষয়ক সুবিদিত ও তর্কাতীত ঘটনাটিকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করেছেন, কেননা সমস্ত পণ্যের মোট মূল্য তার মোট দামের সমান। (সামাজিক) মূল্যের সঙ্গে (ব্যক্তিমূলক) দামের সমীকরণ অবশ্য সরলভাবে ও সোজাসুজি হয়না, হয় অতি জটিল এক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। যে সমাজে আলাদা আলাদা পণ্য উৎপাদকদের মধ্যে কেবলমাত্র বাজারের মারফতই মিলন সম্ভব, সেখানে খুবই স্বাভাবিক যে নিয়মবদ্ধতা শুধুমাত্র গড়পড়তা, সামাজিক, সমষ্টিগত নিয়মবদ্ধতা ছাড়া অন্য কোনভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনা, সেখানে বিশেষ এক একটা ক্ষেত্রের এদিক বা ওদিকের হেরফের পরস্পর কাটাকাটি হয়ে যায়।

শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির অর্থ হল পরিবর্তনশীল পুঁজির তুলনায় স্থির পুঁজির অধিকতর দ্রুত বৃদ্ধি। এবং উদ্বৃত্ত মূল্য যেহেতু সৃষ্টি হয় কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল পুঁজি থেকে, তাই একথা খুবই পরিষ্কার যে মুনাফার হার (শুধু পরিবর্তনশীল পুঁজির সঙ্গে নয়, সমগ্র পুঁজির সঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্যের অনুপাত) ক্রমশ কমে যাবার ঝোঁক দেখায়। ...বাজারে উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহের গড় দামের সঙ্গে উন্নততর জমিতে (কিংবা উন্নততর অবস্থাধীনে) উৎপাদন দামের যে পার্থক্য হয় তাই হল *আন্তর* খাজনা। এই বিষয়টা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে, এই আন্তর খাজনা কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিখণ্ডের

উর্বরতার বিভিন্নতা থেকে, আর জমিতে যে পুঁজি বিনিয়োগ করা হচ্ছে তার পরিমাণের বিভিন্নতা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে তা দেখিয়ে মার্কস পুরোপুরি উদ্ঘাটন করেছেন রিকার্ডোর এই ভ্রান্তি যেন আন্তর খাজনার সৃষ্টি হয় কেবল ক্রমান্বয়ে ভালো জমি থেকে খারাপ জমিতে উত্তরণে। কিন্তু উল্টো দিকের উত্তরণও তো ঘটে, এক ধরনের জমি রূপান্তরিত হয় অন্য ধরনের জমিতে (কৃষি প্রযুক্তির অগ্রগতি, শহরের বৃদ্ধি ইত্যাদি কারনে); এবং 'ভূমির ক্রমক্ষয়িষ্ণু উর্বরতার' কুখ্যাত নিয়মটি হল গুরুতর ভ্রান্ত নিয়ম যা পুঁজিবাদের ত্রুটি, সীমাবদ্ধতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকৃতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। কিন্তু জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার ফলে সৃষ্টি হয় একচেটিয়া অধিকার আর তাতে উৎপাদনের এক শাখা থেকে আরেক শাখায় পুঁজির অবাধ চলাচল ব্যাহত হয়। কৃষি উৎপাদনের পুঁজির নিম্নতর আঙ্গিক গঠন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাই ব্যক্তিগতভাবে রয়েছে উচ্চতর মুনাফার হার; কিন্তু এই একচেটিয়া অধিকারের ফলে কৃষি উৎপাদন মুনাফার হারের সমতা-সাধনের পরিপূর্ণ স্বাধীন প্রক্রিয়াটির অন্তর্ভুক্ত হয় না। জমির মালিক একচেটিয়া অধিকারী হিসাবে গড়পড়তার চেয়ে বেশি দাম ধরার সুযোগ পায় আর এই একচেটিয়া দাম থেকেই জন্ম নেয় *অনাপেক্ষিক* খাজনা। পুঁজিবাদের আওতায় আন্তর খাজনার অবসান ঘটানো সম্ভব নয়, কিন্তু অনাপেক্ষিক খাজনার অবসান সম্ভব – যেমন জমির জাতীয়করণ হলে, রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে তার রূপান্তর ঘটলে।

ভুমি খাজনার ইতিহাসের ক্ষেত্রেও মার্কস দেখিয়েছেন, কী করে শ্রম খাজনা রূপান্তরিত হচ্ছে ফসল বা দ্রব্যসামগ্রী হিসেবে প্রদত্ত খাজনায়, তারপর অর্থ খাজনায় এবং পরিশেষে পুঁজিবাদী খাজনায়, যখন কৃষকের বদলে আসছে কৃষি উদ্যোক্তা যে চাষ চালাচ্ছে মজুরি শ্রমের সাহায্যে। 'পুঁজিবাদের ভুমি খাজনার উদ্ভবের' এই বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মার্কস কৃষিতে পুঁজিবাদের বিবর্তন সম্পর্কে যে কয়েকটি সুগভীর (এবং রাশিয়ার মত পশ্চাদবর্তী দেশগুলোর পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ) ধারণা দিয়ে গেছেন তা অনুধাবনযোগ্য। "দ্রব্য হিসেবে প্রদত্ত খাজনা যখন অর্থ খাজনায় রূপান্তরিত হয়, তখন তার অনিবার্য সহগামী শুধু নয়, এমনকি আগে থেকেই সৃষ্টি হয় সম্পত্তিহীন দিনমজুরের একটি শ্রেণী, যারা অর্থের বিনিময়ে ভাড়া খাটে। এই শ্রেণীটির উদ্ভবের পর্বে, যখন তাদের সবে এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে, তখন স্বভাবতই অবস্থাপন্ন খাজনা প্রদানকারী কৃষকদের

মধ্যে নিজেদের কাজে কৃষি শ্রমিক শোষণ করার একটা রীতি বেড়ে উঠতে থাকে, ঠিক যেভাবে সামন্ত যুগে অবস্থাপন্ন ভুমিদাস চাষীরা নিজেরাও আবার ভূমিদাস রাখত। এইসব চাষীদের পক্ষে ক্রমে ক্রমে হাতে কিছু সম্পদ জমিয়ে ভবিষ্যত পুঁজিপতিতে পরিণত হওয়া সম্ভব হয়। স্বাধীনভাবে কৃষিকাজ চালানো আগেকার জমি মালিকদের মধ্যে থেকেই এইভাবে গড়ে উঠে পুঁজিপতি দখলদারদের আঁতুড়ঘর, যাদের বিকাশ নির্ভর করছে কৃষি অঞ্চলের বাইরে পুঁজিবাদী উৎপাদনের সাধারণ বিকাশের ওপর" । "গ্রামবাসীদের একাংশের উচ্ছেদ ও গ্রাম থেকে বিতাড়নের ফলে শিল্প পুঁজির জন্যে শুধু যে শ্রমিক, শ্রমিকের জীবনধারণের উপায় ও তাদের শ্রমের হাতিয়ার 'মুক্ত হয়ে যায়' তাই নয়, আভ্যন্তরীণ বাজারও গড়ে উঠে"। কৃষিজীবী জনগণের দারিদ্র বৃদ্ধি ও ধ্বংস আবার পুঁজির জন্যে শ্রমের মজুত বাহিনী সৃষ্টিতে ভূমিকা নেয়। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই "তাই কৃষিজীবি জনগণের একাংশ অনবরত শহরের বা কারখানা এলাকার (অর্থাৎ কৃষিজীবি নয়) সর্বহারায় পরিণত হবার অবস্থায় থাকে। আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনতার এই উৎসটি অবিরাম প্রবহমান। ... গ্রাম্য মেহনতীকে নেমে আসতে হয় সর্বনিম্ন মাত্রার মজুরিতে, এক পা তার সবসময়ই ডুবে থাকে নিঃসতার পাঁকে"। কৃষক যে জমি চাষ করছে তাতে তার ব্যক্তিগত মালিকানা হল ছোট আকারের উৎপাদনের ভিত্তি,... কিন্তু এ ধরণের ছোট আকার উৎপাদন খাপ খায় শুধু একটা অপরিসর আদিম ধাঁচের উৎপাদন ও সমাজের সঙ্গে। পুঁজিবাদের আওতায় কৃষকদের শোষণ শুধু *রূপেই* শিল্প শ্রমিকদের শোষণ থেকে ভিন্ন ধরণের। শোষক একইঃ *পুঁজি*। ব্যক্তি পুঁজিপতিরা ব্যক্তি কৃষকদের শোষন করে *বন্ধকী* ও *সুদী কারবার* মারফত; গোটা পুঁজিপতি শ্রেণী কৃষক শ্রেণীকে শোষণ করে সরকারী খাজনা মারফত"। "কৃষকদের ছোট আকারের সম্পত্তি এখন পুঁজিপতিদের পক্ষে জমি থেকে মুনাফা, সুদ ও খাজনা আদায়ের অসিলা মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে আর নিজের মজুরিটুকু কী করে তোলা যাবে তার ভার ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে জমি চাষ করে তার উপর" একটা নিয়ম হিসেবে চাষীকে এমনকি তার নিজ মজুরির একটা অংশ পর্যন্ত পুঁজিবাদী সমাজের জন্যে, অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্যে ছেড়ে দিতে হয় এবং নিজেকে নামতে হয় "*আইরিশ প্রজাচাষীর* সমপর্যায়ে আর সমস্ত ব্যাপারটা ঘটছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মালিক হওয়ার অসিলায়"। "যে দেশে

ছোট আকারের চাষাবাদের আধিক্য সে দেশে শস্যের দাম, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি যে দেশে গ্রহণ করা হয়েছে সেখানকার শস্যের দামের চেয়ে যে কম হয়, তার অন্যতম কারণ" কী? । কারণ কৃষক তার উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্যের একাংশ বিনামূল্যে সমাজের হাতে অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতে ছেড়ে দেয়। 'সুতরাং শস্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের "এই নিচু দাম" হল উৎপাদকদের দারিদ্রের ফল, কোন ক্রমেই তাদের শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতার ফল নয়"। ছোট আকারের উৎপাদনের স্বাভাবিক রূপ হল ছোট ভূমি মালিকানা যা পুঁজিবাদের আওতায় অধঃপতিত, বিলুপ্ত ও ধ্বংস হয়। "ছোট ভূমি মালিকানার প্রকৃতিটাই এমন যে তাতে শ্রমের সামাজিক উৎপাদন শক্তির বিকাশ, শ্রমের সামাজিক রূপ, পুঁজির সামাজিক পুঞ্জীভবন, বৃহদাকারে গবাদি পশুপালন এবং বিজ্ঞানের প্রগতিশীল প্রয়োগ সম্ভব নয়। সুদী কারবার ও কর ব্যবস্থার ফলে সর্বত্রই তার নিঃস্বভবন অনিবার্য। জমি কেনার জন্যে পুঁজি ব্যয়ের ফলে সে পুঁজি জমি চাষাবাদ থেকে বাদ পড়ে। উৎপাদন উপায়ের অশেষ বিভক্তিকরণ এবং খোদ উৎপাদকদেরই বিচ্ছিন্নতা"। (সমবায়, অর্থাৎ ছোট চাষীদের সমিতিগুলি অসাধারণ প্রগতিশীল বুর্শোয়া ভূমিকা পালন করলেও তাতে করে এ ঝোঁকটা দুর্বল হয় মাত্র, একেবারে বন্ধ হয়না; একথাও ভুললে চলবেনা যে অবস্থাপন্ন কৃষকদের জন্য সমবায় অনেক কিছু করলেও গরীব চাষীদের ব্যাপক অংশের জন্যে যৎসামান্য করে, প্রায় কিছুই করেনা। তাছাড়া পরে সমবায় সমিতিগুলি মজুরিশ্রমের শোষক হয়ে বসে) "মানুষের শক্তির বিপুল অপচয়। টুকরো মালিকানার নিয়মই হল উৎপাদন অবস্থার ক্রমিক অবনতি, এবং উৎপাদন উপায়ের ক্রমিক বৃদ্ধি"। যেমন শিল্পে তেমনি কৃষিতেও পুঁজিবাদ উৎপাদন প্রক্রিয়ার রূপান্তর ঘটায় শুধু "উৎপাদককে শহীদ বানিয়ে"। "অনেকখানি জায়গায় ছড়িয়ে থাকার দরুন গ্রাম্য শ্রমিকদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে পড়ে, আবার পুঞ্জীভবনের ফলে শহুরে শ্রমিকদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যেমন আধুনিক শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে, তেমনি সাম্প্রতিক পুঁজিবাদী কৃষি ব্যবস্থাতেও শ্রমের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি এবং তার বিপুল সচলতা অর্জন করা হয় শ্রমশক্তিকেই ধ্বংস ও শীর্ণ করে তোলার বিনিময়ে। অধিকন্তু, পুঁজিবাদী কৃষির যা কিছু প্রগতি তা হল শুধু শ্রমিককে নয় ভূমিকেও লুঠ করার কৌশলের প্রগতি। ... সুতরাং পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রযুক্তিবিদ্যা এবং উৎপাদনের সকল

সামাজিক প্রক্রিয়ার সম্মিলনের বিকাশ ঘটায় কেবল এমন পথে যাতে একই সঙ্গে সর্বসম্পদের মূলাধার ভূমি ও শ্রমিকদেরও বিধ্বস্ত করা হয়"।

সমাজতন্ত্র।। সামাজিক বিকাশধারায় বুর্শোয়া যুগের একটি অনিবার্য ফল ও রূপ হল জাতি। বুর্শোয়া অর্থে না হলেও "নিজেকে *জাতি* হিসেবে গঠণ না করে", 'জাতীয়' না হয়ে" শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে শক্তি সঞ্চয় করা, পরিণত হওয়া, গঠিত হওয়া সম্ভব ছিলনা। কিন্তু পুঁজিবাদের বিকাশে জাতীয় গন্ডি ক্রমেই বেশি করে ভাঙতে থাকে, জাতীয় বিচ্ছিন্নতার অবসান হয় এবং জাতি বৈরিতার বদলে দেখা যায় শ্রেণীবৈরিতা। সুতরাং, বিকশিত পুঁজিবাদী দেশের ক্ষেত্রে একথা পুরোপুরি সত্য যে, "শ্রমজীবিদের দেশ নেই" এবং অন্ততপক্ষে সুসভ্য দেশগুলির শ্রমিকদের "মিলিত প্রচেষ্টাই" হল "সর্বহারাশ্রেণীর মুক্তির অন্যতম প্রথম শর্ত"। রাষ্ট্র হল সংগঠিত বলপ্রয়োগ, তার উদ্ভব হয় সমাজ বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে যখন সমাজ আপোসহীন শ্রেণীতে ভাগ হয়ে পড়ে, যখন বাহ্যত সমাজের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এবং সমাজ থেকে কিছু পরিমানে স্বতন্ত্র একটা 'কর্তৃত্ব' ছাড়া সমাজ টিকতে পারছেনা। শ্রেণীবিরোধের মধ্যে থেকে উদ্ভূত হয়ে রাষ্ট্র হয়ে পড়ে "সবচেয়ে শক্তিশালী ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্যকারী শ্রেণীর রাষ্ট্র, এই শ্রেণী রাষ্ট্রের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রেও আধিপত্যকারী শ্রেণী হয়ে উঠে এবং তার ফলে নিপীড়িত শ্রেণীর উপর দমন ও শোষণ চালানোর নতুন হাতিয়ার লাভ করে। এইভাবে প্রাচীন যুগে রাষ্ট্র ছিল সর্বোপরি ক্রীতদাসের দমনের জন্যে দাসমালিকদের রাষ্ট্র, যেমন সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল ভূমিদাস কৃষকদের বশে রাখার জন্যে অভিজাতদের সংস্থা এবং আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র হচ্ছে পুঁজি কর্তৃক মজুরি শ্রম শোষণের হাতিয়ার'। যে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বুর্শোয়া রাষ্ট্রের সবচেয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতামূলক, সবচেয়ে প্রগতিশীল রূপ সেখানেও এ ব্যাপারটা এতটুকু মোছেনা, বদলায় শুধু তার রূপ । সমাজতন্ত্র শ্রেণীর বিলোপ ঘটিয়ে বিলোপ ঘটায় রাষ্ট্রের। সমগ্র সমাজের নামে উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা দখল করা—সেই হবে যুগপৎ রাষ্ট্র হিসেবে তার শেষ স্বাধীন কাজ। সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ক্রমেই একের পর এক ক্ষেত্রে অবান্তর হয়ে উঠতে থাকবে ও নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যক্তিদের প্রশাসনের বদলে আসে বস্তুর প্রশাসন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ।

রাষ্ট্রের 'উচ্ছেদ হবেনা', শুকিয়ে মরবে"। "উৎপাদকদের স্বাধীন ও সমান সম্মিলনের ভিত্তিতে যে সমাজ উৎপাদনকে সংগঠিত করবে, সে সমাজ সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে পাঠিয়ে দেবে তার যোগ্যস্থানেঃ পুরাতত্ত্বের যাদুঘরে, চরকা ও ব্রোঞ্জের কুড়ালের পাশে"।

"...ছোট কৃষকদের সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য হল, প্রথমত, তাদের ব্যক্তিগত উৎপাদন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সমবায়ী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা, জবরদস্তি করে নয়, উদাহারণ দেখিয়ে, এবং এই উদ্দেশ্যে সামাজিক সাহায্যের প্রস্তাব করে। তখন নিশ্চয় ছোট কৃষককে তার ভবিষ্যত সুবিধা দেখিয়ে দেবার প্রচুর সুযোগ আমরা পাব, যে সুবিধা এমনকি আজই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠার কথা"।

সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামের রণকৌশল

এ প্রসঙ্গে মার্কস এঙ্গেলস প্রতিটি দেশের বাস্তব অবস্থ অনুসারে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। যে দেশে বুর্শোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সেখানে তার কথা বলেছেন, এবং অংশ নিয়েছেন। যেখানে কৃষক অভ্যুত্থান জরুরী, যেমন ক্রাকোভে কৃষক অভ্যুত্থানককারী পার্টিকে তারা সমর্থন করেছেন। প্যারিসে অকাল অভ্যুত্থানের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, কিন্তু যখন ১৮৭১ সালে অভ্যুত্থান ঘটে গেল তাকে সর্বোতভাবে সমর্থন করেছেন।।

কেন্দ্রীয় অধ্যয়ন গ্রুপ

বাংলাদেশের সাম্যবাদী পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী

২রা মার্চ, ২০২৪

কার্ল মার্কস
মার্কসবাদের প্রতিপাদ্যসহ
সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৮১৮ সালের ৫ই মে প্রুশিয়ার রাইন অঞ্চলের ত্রিয়ার শহরে কার্ল মার্কসের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন উকিল, ইহুদী যিনি ১৮২৪ সালে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। পরিবারটি ছিল স্বচ্ছল ও সংস্কৃতিবান, কিন্তু বিপ্লবী নয়। ত্রিয়ারের স্কুল থেকে পাশ করে মার্কস প্রথমে বন এবং পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, আইনশাস্ত্র পড়েন, কিন্তু ইতিহাস ও দর্শন অধ্যয়নে সবচেয়ে বেশী মনোযোগ দেন। ১৮৪১ সালে তিনি পাঠ সমাপ্ত করে এপিকিউরাসের দর্শন সম্পর্কে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় থিসিস পেশ করেন। মতামতের দিক থেকে মার্কস তখনও ছিলেন হেগেলপন্থী ভাববাদী। বার্লিনে তিনি 'বাম হেগেলপন্থী' (ব্রুনো বাউয়ের প্রভৃতি) গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যারা হেগেলের দর্শন থেকে নিরীশ্বরবাদী ও বিপ্লবী সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা করতেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে মার্কস অধ্যাপক হবেন আশা করে বন শহরে আসেন। কিন্তু সরকারের যে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ১৮৩২ সালে ল্যুদভিগ ফয়েরবাখকে অধ্যাপক পদ থেকে বিতাড়িত করে ও ১৮৩৬ সালে আর তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি, এবং ১৮৪১ সালে তরুণ অধ্যাপক ব্রুনো বাউয়েরের বক্তৃতার অধিকার কেড়ে নেয়, সেই কারণে মার্কস অধ্যাপনা জীবন ছাড়তে বাধ্য হন। সে সময় জার্মানীতে বাম হেগেলপন্থীদের মতামত অতি দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠছিল। ল্যুদভিগ ফয়েরবাখ বিশেষ করে ১৮৩৬ সালের পর থেকে ধর্মতত্ত্বের সমালোচনা শুরু করেন এবং মোড় ফেরেন বস্তুবাদের দিকে, যা ১৮৪১ সালে

তাঁর দর্শনের মধ্যে (*খৃষ্টধর্মের সারমর্ম*) প্রধান হয়ে উঠে। ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর *ভবিষ্যত দর্শনশাস্ত্রের মূলসূত্র*। ফয়েরবাখের এইসব রচনা সম্পর্কে এঙ্গেলস পরে লিখেছিলেন, এইসব বইয়ের "মুক্তিকারী প্রভাব নিজের অভিজ্ঞতায় অনুভব করার মত"। "আমরা সকলে" (অর্থাৎ মার্কসসমেত বাম হেগেলপন্থীরা) "তৎক্ষণাৎ ফয়েরবাখপন্থী হয়ে গেলাম"(*এঙ্গেলস, "ল্যুদভিগ ফয়েরবাখ ও ধ্রুপদী জার্মান দর্শনের অবসান*)। এই সময়ে বাম হেগেলপন্থীদের সঙ্গে যাঁদের কিছু কিছু মিল ছিল রাইন অঞ্চলের এমন কিছু রেডিক্যাল বুর্শোয়া কলোন শহরে *রাইনিশ সংবাদপত্র (রাইনিশ জাইতুঙ)* নামে সরকারবিরোধী একটি পত্রিকা স্থাপন করেন (প্রকাশ শুরু হয় ১৮৪২ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে)। মার্কস ও ব্রুনো বাউয়েরকে পত্রিকাটির প্রধান লেখক হবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৮৪২ সালের অক্টোবরে মার্কস পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক হয়ে বন থেকে কলোনে চলে আসেন। মার্কসের সম্পাদনায় পত্রিকাটির বিপ্লবী গণতান্ত্রিক প্রবণতা উত্তরোত্তর স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে এবং সরকার পত্রিকাটি ওপর প্রথমে দুইদফা ও তিনদফা নিষিদ্ধ করে এবং পরে ১৮৪৩ সালের ১লা জানুয়ারী পত্রিকাটিকে একেবারেই বন্ধ করার সিদ্ধান্ত করে। এই সময় মার্কসকে কাগজের সম্পাদনা থেকে পদত্যাগ করতে হয়, কিন্ত পদত্যাগ করেও পত্রিকা রক্ষা পেলনা, ১৮৪৩ সালের মার্চ মাসে সেটি বন্ধ হয়ে গেল। *রাইনিশ সংবাদপত্রে* মার্কসের প্রধান প্রধান লেখা হিসাবে নিচে যেগুলির নাম দেওয়া হয়েছে (গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য), তাছাড়াও মোসেল উপত্যকায় আঙুর চাষীদের অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধের (কার্ল মার্কস লিখিত "মোসেল সাংবাদিকের সত্যতা প্রমাণ" প্রবন্ধ) উল্লেখ এঙ্গেলস করেছেন। পত্রিকায় কাজ করে মার্কস বুঝলেন রাজনৈতিক অর্থনীতির সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় নেই, তাই এ বিষয় তিনি সাগ্রহে অধ্যয়ন শুরু করলেন।

১৮৪৩ সালে ক্রয়েজনাখ শহরে মার্কস জেনি ফন ভেস্তফেলেনকে বিবাহ করেন। জেনি তাঁর বাল্যবন্ধু, ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁদের বাকদান হয়েছিল। মার্কসের স্ত্রী প্রুশিয়ার এক অভিজাত প্রতিক্রিয়াশীল পরিবারের মেয়ে। প্রুশিয়ার এক সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াশীল যুগে, ১৮৫০-১৮৫৮ সালে তাঁর বড় ভাই প্রুশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। আর্নোলদ রুগের জন্ম ১৮০২, মৃত্যু ১৮৮০, তিনি একজন বাম হেগেলপন্থী, ১৮২৫-১৮৩০ কারারুদ্ধ; ১৮৪৮ সালের পর বিদেশে নির্বাসিত; ১৮৬৬-১৮৭০ সালের পর বিসমার্কপন্থী। এই রুগের সঙ্গে একত্রে বিদেশ থেকে একটি রেডিক্যাল পত্রিকা বার করার জন্যে মার্কস ১৮৪৩ সালের শরৎকালে প্যারিসে আসেন। জার্মান-ফরাসী বার্ষিকী (ডয়েচ ফ্রান্সইশে জরবুখের) নামক এই পত্রিকাটির শুধু একটি সংখ্যাই বের হয়েছিল। জার্মানীতে গোপন প্রচারের অসুবিধা এবং রুগের সাথে মতভেদের ফলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এই পত্রিকায় মার্কস যেসব প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে তখনই তিনি আবির্ভূত হন এমন এক বিপ্লবী রূপে যিনি *'বিদ্যমান সব কিছুর নির্মম সমালোচনা', বিশেষ করে 'অস্ত্রের দ্বারা সমালোচনা'* ঘোষণা করেন (কার্ল মার্কস লিখিত "হেগেলের অধিকার বিষয়ক দর্শনের সমালোচনা প্রসঙ্গে) এবং আবেদন জানান *জনগণ* ও *সর্বহারা শ্রেণী*র প্রতি।

১৮৪৪ সালের সেপ্টেম্বরের ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস কয়েক দিনের জন্য প্যারিসে আসেন আর তখন থেকে মার্কসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেন। উভয়েই তাঁরা প্যারিসের সেসময়ের বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির টগবগে জীবনে অত্যন্ত উদ্দীপ্ত অংশ নেন এবং ক্ষুদে বুর্শোয়া সমাজতন্ত্রের নানাবিধ মতবাদের সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে (বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল প্রুঁধোর মতবাদ, ১৮৪৭ সালে মার্কস তাঁর 'দর্শনের দারিদ্র্য' গ্রন্থে সে মতকে সামগ্রিকভাবে চূর্ণ করেছিলেন) বিপ্লবী সর্বহারা সমাজতন্ত্র অথবা সাম্যবাদের (মার্কসবাদের) তত্ত্ব ও রণকৌশল গড়ে তোলেন। নিচের গ্রন্থপঞ্জীতে মার্কসের এই যুগের (১৮৪৪-১৮৪৮) লেখাগুলি দ্রষ্টব্য। প্রুশীয় সরকারের দাবিতে

১৮৪৫ সালে বিপজ্জনক বিপ্লবী বলে মার্কসকে প্যারিস থেকে বহিষ্কার করা হয়। মার্কস ব্রাসেলসে আসেন। ১৮৪৭ সালের বসন্তে তিনি ও এঙ্গেলস 'সাম্যবাদী লীগ' নামে একটি গোপন প্রচার সমিতিতে যোগ দেন। ১৮৪৭ সালের নভেম্বরে লন্ডনে অনুষ্ঠিত লীগের দ্বিতীয় কংগ্রেসে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং কংগ্রেস থেকে ভার পেয়ে তাঁরা সুবিখ্যাত *সাম্যবাদী পার্টির ইশতেহার* রচনা করেন, ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে তা প্রকাশিত হয়। প্রতিভাদীপ্ত স্পষ্টতা ও উজ্জ্বলতায় এই রচনাটিতে রূপায়িত হয়েছে নতুন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীঃ সুসঙ্গত বস্তুবাদ যা সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, বিকাশের সবচেয়ে সামগ্রিক ও সুগভীর মতবাদ দ্বন্দ্ববাদ, শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব এবং নতুন সাম্যবাদী সমাজের স্রষ্টা সর্বহারা শ্রেণীর বিশ্ব ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকার তত্ত্ব।

১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু হওয়ায় (১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফ্রান্সে বুর্শোয়া বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে) মার্কস বেলজিয়াম থেকে নির্বাসিত হন। তিনি আবার প্যারিসে চলে এলেন এবং মার্চ বিপ্লবের পর (১৮৪৮ সালের মার্চে সূচিত জার্মান ও অস্ট্রিয়ার বুর্শোয়া বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে) ফিরে যান জার্মানির কলোন শহরে। এইখানে প্রকাশিত হয় নতুন রাইনিশ সংবাদপত্র (নায় রাইনিশ জাইতুঙ) ১৮৪৮ সালের ১লা জুন থেকে ১৮৪৯ সালের ১৯শে মে পর্যন্ত। মার্কস ছিলেন তার প্রধান সম্পাদক। নতুন তত্ত্বের চমৎকার সমর্থন পাওয়া গেল ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবী ঘটনাস্রোতের গতিতে, যেমন তা সমর্থিত হয়েছে পরবর্তী কালের পৃথিবীর সব দেশের সমস্ত সর্বহারা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে। প্রথমে বিজয়ী প্রতিবিপ্লব মার্কসকে আদালতে অভিযুক্ত করে যেখানে ১৮৪৯ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন এবং পরে ১৮৪৯ সালের ১৬ই মে তাকে নির্বাসিত করে জার্মানি থেকে। মার্কস প্রথমে প্যারিসে গেলেন, ১৮৪৯ সালের ১৩ই জুনের শোভাযাত্রার পর (টীকাঃ ১৮৪৯ সালের ১৩ই জুন ছোট বুর্শোয়া

পর্বত সংগঠন প্যারিসে এক শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের আয়োজন করে ইতালীয় বিপ্লব দমনে ফ্রান্সের সৈন্য প্রেরণের বিরুদ্ধে। ফ্রান্সের এই সৈন্যপ্রেরণ ছিল ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের লংঘন, যে সংবিধান বিদেশের জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনে হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে। এই মিছিলকে সরকারী বাহিনী ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই ব্যর্থতা ফরাসী ছোট বুর্শোয়ার দেউলিয়াপনার পরীক্ষা। ১৩ই জুন থেকে ফরাসী কর্তৃপক্ষ ফ্রান্সে বসবাসকারীসমেত গণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দমন নিপীড়ণ শুরু করে) সেখান থেকেও পুনরায় নির্বাসিত হয়ে লন্ডনে আসেন এবং সেখানেই বাকি জীবন কাটান।

মার্কসের নির্বাসিত জীবন অত্যন্ত কষ্টে কাটে, ১৯১৩ সালে প্রকাশিত মার্কস-এঙ্গেলস পত্রাবলী (১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বরে জার্মানীতে চার খণ্ডে প্রকাশিত কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের পত্রাবলীর কথা বলছেন লেনিন) থেকে বিশেষ পরিষ্কার করে ফুটে উঠেছে। মার্কস ও তাঁর পরিবার সীমাহীন অভাব অনটনে ভোগেন; এঙ্গেলসের নিরন্তর ও নিবেদিতপ্রাণ অর্থ সাহায্য না পেলে মার্কসের পক্ষে 'পুঁজি' বইটি শেষ করা তো দূরের কথা, অভাবের তাড়নায় তিনি নিশ্চিত মারা পড়তেন। তাছাড়া, ছোট বুর্শোয়া সমাজতন্ত্রের, সাধারণভাবে অসর্বহারা সমাজতন্ত্রের প্রাধান্যকারী মতবাদ ও ধারাগুলি মার্কসকে নিরন্তর কঠিন সংগ্রামে বাধ্য করেছে এবং মাঝে মাঝে অতি ক্ষিপ্ত বন্য ব্যক্তিগত আক্রমণও প্রতিহত করতে হয়েছে তাঁকে (জনাব ফগত বা হের ফগত) (বহুল প্রচারিত জার্মান সাধারণ পত্রিকা "এলজেমেইন জাইতুঙের বিরুদ্ধে আমার মামলা" নামে বোনাপার্টের দালাল ফগত যে কুৎসামূলক লেখা লেখেন তার জবাবে কার্ল মার্কস লিখিত *জনাব ফগত* পুস্তিকার কথা বলছেন লেনিন)। দেশান্তরী চক্রগুলি থেকে দূরত্ব বজায় রেখে মার্কস তাঁর বেশ কিছু ঐতিহাসিক রচনায় (গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য) নিজের বস্তুবাদী তত্ত্ব বিকশিত করে তোলেন, রাজনৈতিক অর্থনীতির অধ্যয়নে প্রধানভাবে মনোযোগ দেন এবং

'রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে' (১৮৫৯) এবং *'পুঁজি'* (প্রথম খন্ড, ১৮৬৭) রচনা করে তিনি এই বিজ্ঞানে বিপ্লব সাধন করেছেন (এই রচনায় 'মার্কসের মতবাদ' দ্রষ্টব্য)।

পঞ্চম দশকের শেষে ও ষষ্ঠ দশকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনের কাল মার্কসকে আবারো ব্যবহারিক কার্যকলাপের মধ্যে ডাক দেয়। ১৮৬৪ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর লন্ডনে বিখ্যাত প্রথম আন্তর্জাতিক 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ'-এর প্রতিষ্ঠা হয়। মার্কস ছিলেন এই সমিতির প্রাণস্বরূপ, এর প্রথম অভিভাষণ, বহুবিধ প্রস্তাব, ঘোষণা ও ইশতেহার তাঁরই লেখা। বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করে, বিভিন্ন ধরণের প্রাক-মার্কসীয় অসর্বহারা সমাজতন্ত্রকে যেমন মাৎসিনি, প্রুধোঁ, বাকুনিন, ইংল্যান্ডের উদারনীতিক ট্রেড ইউনিয়নবাদ, জার্মানিতে লাসালপন্থীদের ডানপন্থী দোদুল্যমানতা ইত্যাদিকে সংযুক্ত কার্যকলাপের পথে চালনার চেষ্টা করেন এবং এই সব সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগুলির মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে চালাতে মার্কস বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সর্বহারা সংগ্রামের একটি সুষম রণকৌশল গড়ে তোলেন। যে প্যারিস কমিউনের অমন সুগভীর, পরিষ্কার, চমৎকার, কার্যকরী, বিপ্লবী মূল্যায়ন মার্কস উপস্থিত করেন ('ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', ১৮৭১) তার পতন (১৮৭১) (টীকাঃ প্যারিস কমিউনঃ ১৮৭১ সালের অভ্যুত্থানে প্যারিসের শ্রমিকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী সরকার। ১৮ই মার্চ থেকে ২৮শে মে পর্যন্ত ৭৩ দিন তা টিকে থাকে। কমিউন রাষ্ট্র থেকে গির্জা আর গির্জা থেকে স্কুলকে বিচ্ছিন্ন করে, স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর বদলে আনে সার্বজনীন সশস্ত্র জনগণকে, জনগণ কর্তৃক বিচারক ও রাজ কর্মচারীদের নির্বাচন চালু করে, স্থির করে রাজ কর্মচারীদের বেতন শ্রমিকদের বেতনের চেয়ে বেশি হওয়া চলবেনা, শ্রমিক ও শহুরে গরিবদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নে একগুচ্ছ ব্যবস্থা ইত্যাদি নেয়। প্যারী কমিউন বুর্শোয়াদের ব্যাংক ব্যবস্থা ভাঙেনি এবং গ্রামের জনসমর্থন নেয়নি। বুর্শোয়ারা এর সুযোগ নেয়।

১৮৭১ সালের ২১শে মে তিয়েরের বুর্শোয়া প্রতিবিপ্লবী সৈন্য প্যারিসে প্রবেশ করে ও প্যারিস শ্রমিকদের ওপর নিষ্ঠুর দমননীতি চালায়। প্রায় ৩০,০০০ জন নিহত, ৫০,০০০ জন গ্রেফতার ও হাজার হাজার লোক কারাদন্ডিত হয়) ও বাকুনিনপন্থীগণ কর্তৃক প্রথম আন্তর্জাতিকের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পর ইউরোপে সংগঠনটির অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে পড়ল। আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেস ১৮৭২-এর পর মার্কস আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদকে নিউইয়র্কে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন। প্রথম আন্তর্জাতিক তার ঐতিহাসিক ভূমিকা সমাপ্ত করে। পৃথিবীর সমস্ত দেশে শ্রমিক আন্দোলনের অপরিসীম বৃদ্ধির একটা যুগ, তার প্রসারব্যপ্তি আর ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক গণ শ্রমিক পার্টি সৃষ্টির একটা যুগের জন্যই তা পথ ছেড়ে দেয়।

আন্তর্জাতিকে কঠিন পরিশ্রম এবং তত্ত্বগত কাজের জন্যে কঠিনতর শ্রম দেয়ার ফলে মার্কসের স্বাস্থ্য চূড়ান্তরূপে ভেঙে গিয়েছিল। রাজনৈতিক অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানো এবং *পুঁজি* বইটিকে সম্পূর্ণ করার কাজ তিনি চালিয়ে যান, রাশি রাশি নতুন তথ্য সংগ্রহ করে ও বেশ কিছু ভাষা (যেমন রুশ) আয়ত্ত করেন, কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যে *পুঁজি* বইখানি সম্পূর্ণ করা তাঁর হয়ে উঠলনা।

১৮৮১ সালের ২রা ডিসেম্বর তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ১৮৮৩ সালের ১৪ই মার্চ আরাম কেদারায় বসে শান্তভাবে মার্কস তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। লন্ডনের হাইগেট সমাধিক্ষেত্রে মার্কসকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সমাধিস্থ করা হয়। মার্কসের সন্তানদের মধ্যে কিছু শৈশবেই মারা যায় লন্ডনে, যখন চরম অভাবের মধ্যে পরিবারটি বাস করছিল। এলেওনেরা আভেলিং, লরা লাফার্গ ও জেনি লঁগে—মেয়েদের এই তিনজনের বিয়ে হয় ইংরেজ ও ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে। শেষোক্ত জনের পুত্র ফরাসী সমাজ গণতন্ত্রী পার্টির একজন সদস্য।

মার্কসবাদী মতবাদ

মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গী ও শিক্ষামালার নাম *মার্কসবাদ*। ধ্রুপদী জার্মান দর্শন, ধ্রুপদী ইংরেজী রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং ফরাসী সমাজতন্ত্র তথা সাধারণভাবে ফরাসী বিপ্লবী মতবাদ—মানবজাতির সবচেয়ে অগ্রসর তিনটি দেশে আবির্ভূত ঊনিশ শতকের এই তিনটি প্রধান মতাদর্শগত ধারার ধারাবাহক ও প্রতিভাধর পূর্ণতাসাধক হলেন মার্কস। পৃথিবীর সমস্ত সুসভ্য দেশের শ্রমিক আন্দোলনের তত্ত্ব ও কর্মসূচি স্বরূপ আধুনিক বস্তুবাদ ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র পাওয়া যায় মার্কসের যে মতামতের সমগ্রতা থেকে, তার অপূর্ব সঙ্গতি ও অখন্ডতা তাঁর বিরোধীরা পর্যন্ত স্বীকার করে। তাই, মার্কসবাদের প্রধান বস্তু, অর্থাৎ মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদ ব্যাখ্যা করার আগে মার্কসের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী বিষয়ে সাধারণভাবে একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা প্রদান করা দরকার।

দার্শনিক বস্তুবাদ

১৮৪৪-৪৫ সালে যখন মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গী রূপ নিচ্ছিল তখন থেকেই তিনি বস্তুবাদী, বিশেষ করে ল্যুদভিগ ফয়েরবাখের অনুসারী, কিন্তু পরপরই মার্কস লক্ষ্য করলেন যে ফয়েরবাখের দুর্বল দিকগুলির একমাত্র কারণ এই যে তাঁর বস্তুবাদ যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সামগ্রিক নয়। মার্কস মনে করতেন ফয়েরবাখের বিশ্ব ঐতিহাসিক, ‘যুগান্তকারী’ গুরুত্ব ঠিক এই যে তিনি হেগেলের ভাববাদ দৃঢ়ভাবে পরিত্যাগ করে ঘোষণা করেছিলেন বস্তুবাদের, ইতিপূর্বেই “অষ্টাদশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে ফ্রান্সে যার সংগ্রাম বেধেছিল শুধু প্রচলিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং সেই সঙ্গে ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে শুধু নয়... সকল অধিবিধ্যা (অর্থাৎ ‘সংযত দর্শনচিন্তার’ বদলে ‘মাতাল কল্পানুমান’)-এর সঙ্গেও” (‘সাহিত্যিক উত্তরাধিকার’ পুস্তকের ‘পবিত্র পরিবার’ দ্রষ্টব্য)। মার্কস লিখেছিলেন, “হেগেলের কাছে চিন্তার প্রক্রিয়া হল বাস্তব জগতের স্রষ্টা, নির্মাতা। এই প্রক্রিয়াকে তিনি ভাব আখ্যা দিয়ে একটি

স্বাধীন কর্তায় পর্যন্ত পরিণত করেছিলেন... উল্টোদিকে, ভাব আমার কাছে মানব মনে প্রতিফলিত ও সেখানে রূপান্তরিত বাস্তব ছাড়া কিছু নয়" ('পুঁজি', প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা)। মার্কসের এই বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে এবং তারই বিবরণ প্রসঙ্গে ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস তাঁর 'দ্যুরিংয়ের খণ্ডন' গ্রন্থে (দ্রষ্টব্য) লেখেন (বইটির পাণ্ডুলিপি মার্কস পড়েছিলেন): "বিশ্বজগতের ঐক্য তার অস্তিত্বে নয়, তার বস্তুময়তায় ... দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য অগ্রগতির মধ্য থেকে তার প্রমাণ মিলবে"... "*গতিই হল বস্তুর অস্তিত্বের রূপ।* গতিহীন বস্তু অথবা বস্তুবিচ্ছিন্ন গতি কোথাও কখনো ছিলনা, থাকতেও পারেনা ... গতিহীন বস্তু বস্তুহীন গতির মতই অবাস্তব"। "যদি প্রশ্ন করা যায়... ভাবনা ও চেতনা কী জিনিস, কোথা থেকেই বা তারা এল, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে মানুষের মস্তিষ্ক থেকে তাদের সৃষ্টি আর খোদ মানুষেরও সৃষ্টি প্রকৃতি জগত থেকে, একটা নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই সে বিকাশমান। এ থেকে এটা স্বতসিদ্ধ যে মানব মস্তিষ্কের সৃষ্টি চূড়ান্ত বিবেচনায় প্রকৃতিরই সৃষ্টি হওয়ায় তা অবশিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পর্কগুলির বিরোধী নয়, বরং সামঞ্জস্যপূর্ণ"। "হেগেল ছিলেন ভাববাদী, অর্থাৎ তাঁর কাছে মানসিক ভাবনা বাস্তব বস্তু ও প্রক্রিয়ার কমবেশি বিমূর্ত প্রতিচ্ছবি (প্রতিচ্ছবি, প্রতিফলন, মাঝে মাঝে এঙ্গেলস 'ছাপ' লিখেছেন) নয়, বরং বিপরীতভাবে তাঁর মতে বিশ্বজগত আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই অস্তিত্বশীল কোন এক ভাবের বাস্তবে রূপ নেয়া প্রতিচ্ছবিই হল বস্তু ও তার বিকাশ"। 'ল্যুদভিগ ফয়েরবাখ' বইখানিতে এঙ্গেলস ফয়েরবাখের দর্শন সম্পর্কে তাঁর ও মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গী হাজির করেছেন, হেগেল, ফয়েরবাখ ও ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার বিষয়ে ১৮৪৪-৪৫ সালে তিনি ও মার্কস যা লিখেছিলেন তার পুরনো পান্ডুলিপিটি আবার সযত্নে পড়ে দেখার পর তিনি এ বইটি ছাপতে দিয়েছিলেন, এখানে তিনি লিখেছেনঃ "সমস্ত দর্শনের, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক দর্শনচিন্তার বিরাট বনিয়াদী প্রশ্ন হল অস্তিত্বের সঙ্গে চিন্তার, প্রকৃতির সঙ্গে মনের সম্পর্ক বিষয়ক প্রশ্ন...

কোনটা কার আগেঃ মনের আগে প্রকৃতি না প্রকৃতির আগে মন... এই প্রশ্নের উত্তর যে যেমন দিয়েছেন সেই অনুসারে দার্শনিকেরা দুইটি বৃহৎ শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। যাঁরা প্রকৃতির আগেই মনের অস্তিত্ব ঘোষণা এবং সেই কারনে শেষ পর্যন্ত কোন না কোনভাবে বিশ্ব সৃষ্টির প্রকল্প মেনেছেন... তাঁরা হলেন ভাববাদী শিবির। যাঁরা প্রকৃতিকেই আদি বলে ধরেছেন তাঁরা হলেন বিভিন্ন গোষ্ঠীর বস্তুবাদী"। এ ছাড়া অন্য কোন অর্থে দার্শনিক ভাববাদ ও বস্তুবাদ কথাটির ব্যবহার শুধু বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি করবে। সর্বদাই কোন না কোন রূপে ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাববাদকেই যে শুধু মার্কস চূড়ান্তরূপে বর্জন করেছেন তাই নয়, আমাদের সময়ে যা বিশেষ প্রসার লাভ করেছে হিউম ও কান্টের সেই সব দৃষ্টিভঙ্গী, অজ্ঞেয়বাদ, সমালোচনাবাদ, বিভিন্ন ধরণের দৃষ্টবাদী মতবাদকেও নাকচ করেছেন যেগুলোকে তিনি মনে করেছেন ভাববাদের কাছে "প্রতিক্রিয়াশীল" নতিস্বীকার, কিংবা বড়জোর "বস্তুবাদকে জগতের সামনে অস্বীকার করে গোপনে তা গ্রহণ করার এক লজ্জিত ধরণ মাত্র" (*ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস, ল্যুদভিগ ফয়েরবাখ ও ধ্রুপদী জার্মান দর্শনের অবসান*)। এই প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলসের পূর্বোক্ত রচনাবলী ছাড়াও ১৮৬৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর এঙ্গেলসের কাছে লেখা মার্কসের একটি চিঠি দ্রষ্টব্য। তাতে সুবিদিত প্রকৃতি বিজ্ঞানী টমাস হাকস্লির সচরাচরের চেয়ে 'বেশি বস্তুবাদী' উক্তির, এবং "যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সত্যই পর্যবেক্ষণ করছি ও চিন্তা করছি ততক্ষণ বস্তুবাদের মাটি থেকে কদাচ সরে যাওয়া আমাদের সম্ভব নয়", তার এই স্বীকৃতির উল্লেখ করেও তিনি অজ্ঞেয়বাদ ও হিউমবাদের জন্যে 'ফাঁক' রেখে গেছেন বলে মার্কস তাঁকে তিরস্কার করেছেন। আবশ্যিকতার সঙ্গে স্বাধীনতার সম্পর্ক বিষয়ে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্যঃ "... আবশ্যকতার উপলব্ধিই হল স্বাধীনতা"। *"আবশ্যকতার উপলব্ধি না থাকলেই তা অন্ধ"* (*এঙ্গেলস, দ্যুরিংয়ের বক্তব্য খণ্ডন*)। এর অর্থ হল প্রকৃতির বস্তুগত নিয়মবদ্ধতা এবং স্বাধীনতার আবশ্যিকতায় দ্বান্দ্বিক রূপান্তর স্বীকার করা, ঠিক যেভাবে অজ্ঞাত কিন্তু জ্ঞেয় 'নিজের ভেতর নিজে বস্তু' পরিবর্তিত হয়

'আমাদের জন্য বস্তুতে', 'বস্তুর মর্মসার' পরিবর্তিত হয় 'ঘটনায়'। 'সেকেলে' বস্তুবাদ তথা ফয়েরবাখের বস্তুবাদের এবং আরো বিশেষ করে ব্যুখনার, ফগত ও মোলেশৎ এর 'স্থূল' বস্তুবাদের মৌলিক ত্রুটি মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে এইঃ ১। এই বস্তুবাদ 'প্রধানত যান্ত্রিক', রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কারের হিসাব নেয়নি, পদার্থের বৈদ্যুতিক তত্ত্বের কথাটাও আজকের দিনে যোগ করা দরকার। ২। সেকেলে বস্তুবাদ অনৈতিহাসিক ও অদ্বান্দ্বিক। দ্বান্দ্বিকতা বিরোধী অর্থে অধিবিদ্যামূলক, বিকাশের দৃষ্টিকোণকে সুসংগত ও সামগ্রিকভাবে অনুসরণ করেনি। ৩। এতে 'মানব সারকে' 'সর্বপ্রকার' (বিশেষ নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক) 'সামাজিক সম্পর্কের সমষ্টি' হিসাবে না দেখে দেখা হয়েছে বিমূর্তভাবে, সুতরাং এতে শুধু বিশ্বের 'ব্যাখ্যাই করা হয়েছে' যেখানে প্রশ্ন হল বিশ্বকে 'পরিবর্তন করা', অর্থাৎ 'বিপ্লবী ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের' গুরুত্ব এ বস্তুবাদ বোঝেনি।

দ্বন্দ্ববাদ

বিকাশের সবচেয়ে সামগ্রিক, সবচেয়ে বিষয় সমৃদ্ধ এবং সবচেয়ে সুগভীর মতবাদ হিসেবে হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদকে মার্কস ও এঙ্গেলস ধ্রুপদী জার্মান দর্শনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে মনে করতেন। বিকাশের, বিবর্তনের অন্য সমস্ত সূত্রায়ণকে তাঁরা গণ্য করতেন একতরফা ও বিষয়বস্তুতে অনুন্নত, যাতে প্রকৃতিজগতের ও সমাজের সত্যকার বিকাশধারার বিকৃতি ও অঙ্গহানি ঘটানো হয়। এ বিকাশ প্রায়শই উলম্ফন, বিপর্যয় ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ঘটে। "বলা চলে প্রায় একমাত্র মার্কস এবং আমি" হেগেলবাদসমেত ভাববাদের ধ্বংসস্তুপ থেকে "সচেতন দ্বন্দ্ববাদকে উদ্ধার করতে" "এবং প্রকৃতিজগতের বস্তুবাদী ধারণার ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছি"। "দ্বন্দ্ববাদের সমর্থনক্ষেত্র হল প্রকৃতি, এবং ঠিক আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকেই দেখা যাচ্ছে যে এ সমর্থন আসাধারণ সমৃদ্ধ", "যার মধ্যে দিন দিন সঞ্চিত হয়ে উঠছে রাশি রাশি মালমসলা ও তা প্রমাণিত করছে যে চূড়ান্ত বিচারে

প্রকৃতি দ্বান্দ্বিকভাবে কাজ করে, অধিবিদ্যকভাবে নয়" *(ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস, দ্যুরিংয়ের বক্তব্য খণ্ডন, ১১শ অধ্যায়, তিনটি সংস্করণের ভূমিকা)*। এ কথা লেখা হয়েছিল রেডিয়াম, ইলেক্ট্রন, মৌলিক পদার্থের রূপান্তর প্রভৃতি আবিষ্কারের বহু আগেই!

এঙ্গেলস লিখেছেন, "আগে থেকে তৈরি *কতগুলি বস্তু* দিয়ে এ বিশ্ব গড়া নয়, এ বিশ্ব হল *প্রক্রিয়াসমূহের* সামগ্রিকতা, যেখানে আপাত স্থির বস্তু, আমাদের মস্তিষ্কে তাদের মানসপ্রতিচ্ছবি, ধ্যানধারণা চলেছে এক অবিরাম পরিবর্তন স্রোতের মধ্য দিয়ে, কখনো উদ্ভূত হচ্ছে, কখনো ধ্বংস হচ্ছে, এই মহান মৌলিক কথাটি হেগেলের সময় থেকে সর্বজনীন চেতনার সাথে এতখানি মিশে গেছে যে সাধারণ আকারে এ উক্তির প্রতিবাদ কেউ প্রায় করেইনা। কিন্তু এই মূল ভাবনাটিকে মুখে স্বীকার করা এক কথা, আর প্রতিটি আলাদা ঘটনায়, অনুসন্ধানের প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ, সে হল অন্য কথা"। দ্বন্দ্ববাদী দর্শনের কাছে "চিরকালের জন্যে স্থিরনির্দিষ্ট, পরম, পবিত্র বলে কিছুই নেই। সব কিছুরই ওপরেই, সব কিছুর ভেতরেই অস্থায়ী বৈশিষ্ট্য তা দেখে এবং উদ্ভব ও ধ্বংসের এক অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া ছাড়া, নিম্নতর থেকে উচ্চতর পর্যায়ে আরোহন ছাড়া কিছুই এর কাছে টেকেনা। দ্বন্দবাদী দর্শন ব্যাপারটাই হল চিন্তাশীল মনের ওপর এই প্রক্রিয়ারই প্রতিচ্ছবি মাত্র"। এইভাবে মার্কসের মত অনুসারে দ্বন্দ্ববাদ হল "বহির্জগত ও মানবচিন্তা উভয় ক্ষেত্রেই গতির সাধারণ নিয়ম সংক্রান্ত বিজ্ঞান" (*ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস, ল্যুদভিগ ফয়েরবাখ ও ধ্রুপদী জার্মান দর্শনের অবসান*)

হেগেলীয় দর্শনের এই বিপ্লবী দিকটাকে মার্কস গ্রহণ করেন ও তাকে বিকশিত করে তোলেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের "অন্য সমস্ত বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে অবস্থিত কোন দর্শনের প্রয়োজন নেই"। সাবেক দর্শন থেকে রইল শুধু "চিন্তা এবং তার নিয়মকানুনের বিজ্ঞান—আনুষ্ঠানিক যুক্তিবিদ্যা ও দ্বন্দ্ববাদ" (*ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস, দ্যুরিংয়ের বক্তব্য খণ্ডন, ১ম অধ্যায়, সাধারণ মন্তব্য*)। সেই সঙ্গে হেগেলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে

মার্কস যেভাবে দ্বন্দ্ববাদকে বুঝেছিলেন, তাতে সেই দ্বন্দ্ববাদের মধ্যে পড়ে যাকে আজকাল বলা হয় জ্ঞানের তত্ত্ব জ্ঞানতত্ত্ব, এই বিদ্যাটির বিষয়বস্তুকেও দেখতে হবে ঐতিহাসিকভাবে এবং জ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ, অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে উত্তরণকে অধ্যয়ন ও সাধারণীকরণ করতে হবে।

বিকাশের ধারণা, বিবর্তনের ধারণা বর্তমানে প্রায় সমগ্র সামাজিক চেতনার মধ্যে প্রবেশ করেছে, কিন্তু তা করেছে অন্য পথে, হেগেলীয় দর্শনের মধ্য দিয়ে নয়। তবু হেগেলকে ভিত্তি করে মার্কস ও এঙ্গেলস যেভাবে তার সূত্র দিয়েছেন সে আকারে এটা বিবর্তনের প্রচলিত ধ্যান ধারণার চেয়ে অনেক বেশি সামগ্রিক ও অনেক বেশি সারগর্ভ। অতিক্রান্ত স্তরের পুনরাবর্তনের মত বিকাশ, কিন্তু পুনরাবর্তন অন্য একটা উচ্চতর ভিত্তিতেঃ "নেতিকরণের নেতিকরণ"; সরল রেখায় বিকাশ নয়, বলা যেতে পারে সর্পিল আকারে বিকাশ; উলম্ফন, বিপর্যয়, বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে বিকাশ; "ক্রমিকতায় ছেদ", পরিমাণের গুণে রূপান্তর, একটি বস্তুর ওপর, অথবা নির্দিষ্ট ঘটনার পরিসীমার মধ্যে কিংবা একটি সমাজের অভ্যন্তরে সক্রিয় বিভিন্ন শক্তি ও প্রবণতার বিরোধ থেকে, সংঘাত থেকে পাওয়া বিকাশের আভ্যন্তরীণ তাড়না; প্রত্যেকটি ঘটনার *সবকটি* দিকের পম্পরনির্ভরতা এবং সুনিবিড় অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, সেই সঙ্গে আবার ইতিহাস কর্তৃক অনবরত নতুন নতুন দিকের উদ্ঘাটন, এমন সম্পর্ক যা থেকে গতির একক নিয়মানুগ সার্বজনীন প্রক্রিয়ার উদ্ভব, এগুলো হল সচরাচরের তুলনায় বিকাশের আরো সারগর্ভ মতবাদস্বরূপ দ্বন্দ্ববাদের দিকসমূহ। (১৮৬৮ সালের ৮ই জানুয়ারি এঙ্গেলসকে লেখা মার্কসের পত্র দেখুন, এই পত্রে মার্কস বিদ্রুপ করেছিলেন স্তাইনের 'কাঠখোট্রা ত্রয়ী'কে, বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের সঙ্গে যা গুলিয়ে ফেলা হাস্যকর।)

ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা

সেকেলে বস্তুবাদের অসঙ্গতি, অসম্পূর্ণতা ও একতরফাবাদ উপলব্ধি করে মার্কস নিশ্চিত হয়ে উঠলেন যে, "সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে.....বস্তুবাদী ভিত্তির সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা এবং এই ভিত্তির উপর এই বিজ্ঞানের পুনর্গঠন করা প্রয়োজন" (*ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস, ল্যুদভিগ ফয়েরবাখ ও ধ্রুপদী জার্মান দর্শনের অবসান*)। বস্তুবাদ যেহেতু অস্তিত্ব দিয়ে চেতনার ব্যাখ্যা করে, বিপরীতটা নয়, তাই মানুষের সামাজিক জীবনে বস্তুবাদের প্রয়োগ করলে তা *সামাজিক* অস্তিত্ব দিয়ে *সামাজিক* চেতনার ব্যাখ্যা দাবি করবে। পুঁজি, প্রথম খণ্ডের ১৩শ অধ্যায়ে মার্কস লিখেছেন, 'প্রযুক্তিবিদ্যা' 'উদ্ঘাটিত করছে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সক্রিয় সম্পর্ক, তার জীবনের প্রত্যক্ষ উৎপাদন প্রক্রিয়া যা দ্বারা সে বেঁচে থাকে আর সেই সাথে মানুষের সামাজিক পরিস্থিতি এবং তা থেকে উদ্ভূত মানসিক ধ্যান ধারণা'। মানব সমাজ ও মানব ইতিহাসের ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রযুক্ত বস্তুবাদের মূলনীতির সামগ্রিক সূত্র মার্কস তাঁর *রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে* পুস্তকের ভূমিকায় এইভাবে দিয়েছেনঃ

"নিজেদের জীবনের সামাজিক উৎপাদনে মানুষ এমন কতগুলি সুনির্দিষ্ট অপরিহার্য সম্পর্কের মধ্যে, যেমন উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে, যা তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরে, যা বস্তুগত উৎপাদন শক্তির বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরটির পক্ষেই উপযোগী।

"এইসব উৎপাদন সম্পর্কের সমষ্টি থেকেই গড়ে উঠে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, বাস্তব ভিত্তি, এই বাস্তব ভিত্তির উপরেই দাড়া হয় আইনী ও রাজনৈতিক উপরিকাঠামো এবং তারই উপযোগী হয়ে দেখা দেয় সামাজিক চেতনার নির্দিষ্ট রূপগুলি। বস্তুগত জীবনের উৎপাদন পদ্ধতি থেকেই নির্দিষ্ট হয় সাধারণভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও মননবিষয়ক জীবনধারা। মানুষের চেতনা তার অস্তিত্ব নির্ধারন করেনা, বরং মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনাকে নির্ধারন করে।

বিকাশের এক একটা বিশেষ স্তরে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে বিরোধ বাধে সমাজের বস্তুগত উৎপাদন শক্তির, অথবা, ওই একই কথাকে আইনের পরিভাষায় বললে দাঁড়ায়, যে সম্পত্তি মালিকানা সম্পর্কের মধ্যে এই সব উৎপাদন শক্তি এযাবত বিকশিত হচ্ছিল বিরোধ ঘটে তারই সাথে। উৎপাদন শক্তি বিকাশের একটা পর্যায়ে এলে এই সম্পর্ক পরিণত হয় তার শৃঙ্খলে। তখন আরম্ভ হয় সামাজিক বিপ্লবের যুগ। অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল উপরিকাঠামোর সবখানিও কমবেশি ধীরে বা দ্রুত রূপান্তরিত হয়ে থাকে। এই রকমের রূপান্তরের পর্যালোচনা করতে হলে আইনী, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সৌন্দর্যতত্ত্ববিষয়ক বা দার্শনিক, অর্থাৎ, সংক্ষেপে বললে, যে সকল মতাদর্শগত মাধ্যমের মধ্য দিয়ে মানুষ এই বিরোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে ও সংগ্রাম করে তার নিষ্পত্তি করার জন্য, এগুলির থেকে অবশ্যই আলাদা করে দেখতে হবে সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার বস্তুগত রূপান্তরের কথাটা যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতই সঠিকভাবে নির্ধারণ কর সম্ভব।

"নিজের সম্পর্কে যার যা ধারণা, তার ওপরেই যেমন আমরা একটি মানুষ সম্পর্কে আমাদের মতামত স্থির করিনা, তেমনি পরিবর্তনের এইরূপ একটা যুগকেও তার নিজস্ব চেতনা দিয়ে বিচার করা চলেনা। এই চেতনাটাকেই বরং ব্যাখ্যা করতে হবে বস্তুগত জীবনের দ্বন্দ্বগুলি দিয়ে, সামাজিক উৎপাদন শক্তির সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের বিদ্যমান সংঘাত দিয়ে... মোটামুটিভাবে এশীয়, প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক ও আধুনিক বুর্শোয়া উৎপাদন পদ্ধতিকে অর্থনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থার ধারাবাহিক পর্যায় হিসাবে ধরা চলে"। (তুলনীয়, ১৮৬৬ সালের ৭ই জুলাই তারিখে এঙ্গেলসের কাছে লেখা চিঠিতে মার্কসের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাঃ '*শ্রমের সংগঠন নির্ধারিত হচ্ছে উৎপাদনের উপায় দিয়ে*—আমাদের এই তত্ত্ব'।)

ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার আবিষ্কার, কিংবা বলা ভাল, সামাজিক ঘটনার ক্ষেত্রে বস্তুবাদের সুসঙ্গত প্রসারের ফলে পূর্বতন ঐতিহাসিক তত্ত্বাদির

দুটি প্রধান ত্রুটি দূরীভূত হল। প্রথমত, এই সব তত্ত্বে বড়জোর মানুষের ঐতিহাসিক ক্রিয়াকলাপের পেছনে মতাদর্শগত কী প্রেরণা আছে কেবল তারই বিচার করা হত, কিন্তু সে প্রেরণা কোথা থেকে সৃষ্টি হল তার অনুসন্ধান করা হতনা, সামাজিক সম্পর্কের ব্যবস্থার বিকাশে যে বাস্তব নিয়মবদ্ধতা রয়েছে তা বোঝা হতনা, এবং বস্তুগত উৎপাদনের বিকাশ মাত্রার মধ্যে ঐ সব সম্পর্কের মূল খুঁজে দেখা হতনা; দ্বিতীয়ত, পূর্বেকার তত্ত্বে *ব্যাপক* জনগণের কার্যকলাপের স্থান ছিলনা, সেক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতই সঠিকতার সঙ্গে ব্যাপক জনগণের সামাজিক অবস্থা ও তার পরিবর্তন সম্পর্কে অধ্যয়ন সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক বস্তুবাদই সম্ভব করে তুলল। প্রাকমার্কসবাদী 'সমাজবিজ্ঞান' ও ইতিহাসবিদ্যায় বড়জোর কিছু বিচ্ছিন্নবিক্ষিপ্তভাবে সঞ্চিত কাঁচা তথ্যের যোগান দেওয়া হত এবং ইতিহাসের প্রক্রিয়ার বিচ্ছিন্ন কয়েকটি দিকের বর্ণনা থাকত। মার্কসবাদ পরস্পরবিরোধী সমস্ত প্রবণতার যোগফল বিচার করল, সেগুলিকে সমাজের বিভিন্ন *শ্রেণীর* জীবনযাত্রা ও উৎপাদনের পরিস্থিতিতে এনে দাঁড় করাল, বিভিন সব 'আধিপত্যকারী' ধারণার নির্বাচন অথবা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আত্মমুখীনতা ও খেয়ালখুশিপনাকে বর্জন করল, উদ্ঘাটন করে দিল যে বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত ধারণা ও সমস্ত বিভিন্ন প্রবণতার মূল রয়েছে বস্তুগত উৎপাদন শক্তিগুলির পরিস্থিতির মধ্যে, এবং এইভাবে সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব, বিকাশ ও ধ্বংস প্রক্রিয়ার সামগ্রিক ও সার্বিক অধ্যয়নের পথ দেখাল। লোকেরা নিজেরাই নিজেদের ইতিহাস রচনা করে। কিন্তু লোকেদের বিশেষ করে ব্যাপক জনগণের প্রেরণা স্থির হয় কিসে, কোথা থেকে সৃষ্টি হয় পরস্পর বিরোধী ধারণা ও প্রচেষ্টার সংঘাত, মানব সমাজের সমগ্র জনসাধারণের এরকম সমস্ত সঙ্ঘাতের মোট যোগফলটা কী, মানুষের সবকিছু ঐতিহাসিক কার্যকলাপের যা ভিত্তি, সেই বস্তুগত জীবনের উৎপাদনের বাস্তব পরিস্থিতিগুলি কী, এইসব পরিস্থিতির বিকাশের নিয়ম কীরূপ, এইসবের দিকে মার্কস মনোযোগ দেন এবং

একক প্রক্রিয়া হিসেবে ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়নের পথ দেখান, দেখিয়ে দেন যে ইতিহাস তার সবকিছু বৈচিত্র্য ও দ্বন্দ্ব সহকারে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়।

শ্রেণী সংগ্রাম

সবাই জানে যে একটা নির্দিষ্ট সমাজের কিছু লোকের প্রচেষ্টার সঙ্গে অন্য কিছু লোকের প্রচেষ্টার সংঘাত বাধে, সামাজিক জীবন বিরোধে ভরা, ইতিহাসে দেখা যায় শুধু জাতিতে জাতিতে ও সমাজে সমাজে সংগ্রাম নয়, জাতির অভ্যন্তরে, সমাজের অভ্যন্তরেও সংঘাত লাগে এবং উপরন্তু পালা করে দেখা দেয় বিপ্লব ও প্রতিক্রিয়া, শান্তি ও যুদ্ধ, অচলাবস্থা ও দ্রুত প্রগতি অথবা অবক্ষয়ের পর্ব। এই আপাতদৃশ্যমান বিশৃংখলা ও গোলকধাঁধার মধ্যে নিয়মবদ্ধতা আবিষ্কার করার চাবিকাঠি এনে দিয়েছে মার্কসবাদ। সে চাবিকাঠি হল শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব। কোন একটি সমাজ বা সমাজসমষ্টির সকল সদস্যের প্রচেষ্টা-প্রবণতার সমষ্টি পর্যালোচনা করলেই তবে এইসব প্রচেষ্টা-প্রবণতার ফলাফল সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব। আবার প্রত্যেক সমাজ যেসব *শ্রেণীতে* বিভক্ত তাদের অবস্থা ও জীবন পরিস্থিতির পার্থক্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এইসব বিরোধী প্রচেষ্টার মূল। *সাম্যবাদী ইশতেহারে* মার্কস লিখেছেন, 'আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখে গেছে তার ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস' (এঙ্গেলস পরে যোগ করেছেন, আদিম গোষ্ঠীগুলির ইতিহাস এর মধ্যে পড়েনা), "স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যাট্রিশিয়ান (প্রাচীন রোমের অভিজাত মানুষ) ও প্লিবিয়ান (প্রাচীন রোমের সাধারণ মানুষ), জমিদার ও ভূমিদাস, গিল্ড কর্তা (গিল্ড হল মধ্যযুগের শিল্পসংঘ) *[১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকাঃ গিল্ড কর্তা হচ্ছে গিল্ড সংঘের পূর্ণ সদস্য, এর আভ্যন্তরীণ কর্তা, তার প্রভু নয়]*ও কারিগর, এককথায় নিপীড়ক ও নিপীড়িতরা অব্যাহতভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, বিরতিহীনভাবে লড়াই চালিয়েছে কখনো

গোপনে কখনো প্রকাশ্যে, যে লড়াই প্রতিবারই শেষ হয়েছে সমগ্র সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠণে অথবা দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলির সাধারণ ধ্বংসে। ইতিহাসের আগেকার যুগসমূহে আমরা প্রায় সর্বত্রই দেখি সমাজের নানা বর্গের জটিল বিন্যাস, সামাজিক পদ মর্যাদার বহুবিধ স্তর। প্রাচীন রোমে আমরা পাই প্যাট্রিশিয়ান, যোদ্ধা, প্লিবিয়ান, দাস; মধ্যযুগে সামন্ত প্রভু, জায়গিরদার, গিল্ড কর্তা, কারিগর, শিক্ষানবীশ কারিগর, ভূমিদাস প্রভৃতি; এসব প্রায় প্রতিটা শ্রেণীর মধ্যে আবার রয়েছে অধীন উপস্তরসমূহ।...সামন্ত সমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে যে বুর্শোয়া সমাজ জন্ম নিয়েছে তা শ্রেণী বৈরিতার অবসান ঘটায়নি। বরং তা প্রতিষ্ঠা করেছে নতুন শ্রেণীসমূহ, অত্যাচারের নতুন অবস্থা, পুরোনোটার জায়গায় সংগ্রামের নতুন ধরন। আমাদের যুগ, বুর্শোয়া যুগের রয়েছে এই এক বিশিষ্টতাঃ এটা শ্রেণী বৈরিতাকে সরল করেছে। সমাজ বেশি বেশি করে দুই শত্রু ভাবাপন্ন শিবিরে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, মুখোমুখি দাঁড়ানো দুই বিরাট শ্রেণীঃ বুর্শোয়া ও সর্বহারা"। মহান ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে ইউরোপীয় ইতিহাস একাধিক দেশে অতি পরিষ্কারভাবে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে ঘটনাস্রোতের এই আসল অন্তর্বস্তুটিঃ শ্রেণীসংগ্রাম। ফ্রান্সে রাজতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠার পর্বে (টীকাঃ ফ্রান্সের ইতিহাসে ১৮১৪-৩০ সাল; ১৭৯২ সালের ফরাসী বুর্শোয়া বিপ্লবে উৎখাত বুরবোঁ রাজবংশের হাতে এই সময় ফের ক্ষমতা ফিরে যায়) একাধিক ঐতিহাসিক (তিয়েরি, গিজো, মিনিয়ে, তিয়ের) দেখা দেন যাঁরা ঘটনাবলীর সাধারণীকরণ করতে গিয়ে না মেনে পারেননি যে গোটা ফরাসী ইতিহাসের চাবিকাঠি হল শ্রেণীসংগ্রাম। এবং সাম্প্রতিক যুগে, বুর্শোয়াদের পরিপূর্ণ জয়লাভ, প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান, ব্যাপক ভোটাধিকার (সার্বজনীন যদিবা নাও হয়), বহুল প্রচারিত সুলভ দৈনিক সংবাদপত্র, শক্তিশালী ও ক্রমবর্ধমান শ্রমিক সমিতি ও মালিক সঙ্ঘ প্রভৃতির এই যুগে আরো স্পষ্ট করে (যদিও প্রায়ই একতরফা 'শান্তিপূর্ণ ও 'নিয়মতান্ত্রিক' রূপের মধ্য দিয়ে) দেখিয়ে দিয়েছে যে, শ্রেণীসংগ্রামই হল ঘটনাধারার চালিকাশক্তি। প্রত্যেকটি শ্রেণীর বিকাশের শর্ত বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে

আধুনিক সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণীর পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের কী দাবি মার্কস সমাজবিজ্ঞানের কাছে করেছেন, তা বোঝা যাবে মার্কসের *সাম্যবাদী ইশতেহারের* এই অনুচ্ছেদটি থেকেঃ "বুর্শোয়াদের মুখোমুখি যেসব শ্রেণী আজকে দাঁড়িয়ে আছে, সর্বহারা শ্রেণীই তাদের মধ্যে একমাত্র প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণী। অন্য শ্রেণীসমূহ আধুনিক শিল্পের সামনে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়। এই আধুনিক শিল্পেরই বিশেষ ও অপরিহার্য সৃষ্টি হল সর্বহারা। নিম্ন মধ্যশ্রেণী, ক্ষুদে হস্তশিল্প মালিক, দোকানদার, কারিগর, কৃষক—এরা সকলেই বুর্শোয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে মধ্যশ্রেণীর অংশ হিসেবে তাদের অস্তিত্বকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। তারা তাই বিপ্লবী নয়, রক্ষণশীল। শুধু তাই নয়, ইতিহাসের চাকাকে পেছনে ফেরানোর চেষ্টা করে বলে তারা প্রতিক্রিয়াশীলও। সৌভাগ্যত তারা যদি বিপ্লবীও হয় তারা তা হয় সর্বহারায় তাদের আসন্ন রূপান্তরের কারণে, তাই তারা তাদের বর্তমানের স্বার্থ নয়, ভবিষ্যতের স্বার্থ রক্ষা করে, তারা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে সর্বহারার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে"।

বেশ কিছু ঐতিহাসিক রচনায় (গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য) মার্কস বস্তুবাদী ইতিহাসবিদ্যার চমৎকার ও সুগভীর নিদর্শন রেখে গেছেন, আলাদা আলাদা ভাবে *প্রতিটি* শ্রেণীর এবং কখনো কখনো শ্রেণীর বিভিন্ন স্তর ও গোষ্ঠীর অবস্থান বিশ্লেষণ করেছেন ও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন কেন এবং কী করে 'প্রতিটি শ্রেণীসংগ্রামই হল রাজনৈতিক সংগ্রাম' (*কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস, সাম্যবাদী ইশতেহার*)। উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ থেকে দেখা যাবে একটা শ্রেণী থেকে আরেকটা শ্রেণীতে, অতীত থেকে ভবিষ্যতে উৎক্রমণ স্তর ও সমাজ সম্পর্কের কী জটিল জাল মার্কস বিশ্লেষণ করেছেন ঐতিহাসিক বিকাশের সমস্ত ফলাফলের হিসাব নেবার জন্য।

মার্কসের তত্ত্বের সবচেয়ে সুগভীর, পূর্ণাঙ্গ ও বিশদ প্রমাণ তথা প্রয়োগ হল তাঁর অর্থনৈতিক মতবাদ।

মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদ

পুঁজি বইটির ভূমিকায় (১ম খণ্ডে) মার্কস লিখেছেন, "আধুনিক সমাজের, অর্থাৎ পুঁজিবাদী বুর্শোয়া সমাজের 'গতিধারার অর্থনৈতিক নিয়ম উদ্ঘাটন করাই এ রচনার চূড়ান্ত লক্ষ্য"। ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট একটি বিশেষ সমাজের উৎপাদন সম্পর্কের উদ্ভব, বিকাশ ও পতনের অনুসন্ধান—এই হল মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদের বিষয়বস্তু। পুঁজিবাদী সমাজে *পণ্য* উৎপাদনই আধিপত্য করে। মার্কসের বিশ্লেষণ তাই শুরু হয়েছে পণ্যের বিশ্লেষণ দিয়ে।

মূল্য

পণ্য হল প্রথমত এমন একটি বস্তু যা দিয়ে মানুষের কোন একটা চাহিদা মেটে; দ্বিতীয়ত, এ হল এমন একটা বস্তু যার সঙ্গে অন্য বস্তুর বিনিময় চলে। বস্তুর উপযোগিতা থেকে তার ব্যবহার মূল্যের সৃষ্টি। বিনিময় মূল্য (কিংবা সহজ ভাষায় মূল্য) সর্বাগ্রে হল একটি সম্পর্ক, নির্দিষ্ট পরিমাণ এক ধরণের ব্যবহার মূল্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ অন্য ধরণের ব্যবহার মূল্য বিনিময়ের অনুপাত। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাবে যে, এই ধরণের কোটি কোটি বিনিময়ের মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত সব রকমের ব্যবহার মূল্য, এমনকি একেবারে মিল নেই, একেবারে ভিন্ন জাতীয় ব্যবহার মূল্যগুলিকে পর্যন্ত পরস্পর সমীকরণ করা হচ্ছে। সামাজিক সম্পর্কের একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থার ভেতর যেসব বিভিন্ন বস্তু প্রতিনিয়ত পরস্পর সমীকৃত হচ্ছে তাদের মধ্যে সাধারণ মিলটা কী? এদের সাধারণ মিল এইখানে যে এরা সকলেই *শ্রমের ফল*। বস্তুর বিনিময় করতে গিয়ে মানুষ বিভিন্ন ধরণের শ্রমের সমীকরণ করে। পণ্য উৎপাদন হল সামাজিক সম্পর্কের এমন একটা ব্যবস্থা যাতে ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদক ভিন্ন ভিন্ন বস্তু তৈরি করছে (সামাজিক শ্রমবিভাগ), এবং বিনিময়ের মধ্যে সেইসব বস্তুর পারস্পরিক সমীকরণ ঘটছে। সুতরাং সমস্ত পণ্যের মধ্যেই যে সাধারণ জিনিসটা রয়েছে সেটা কোন বিশেষ উৎপাদন শাখার প্রত্যক্ষ শ্রম নয়,

নির্দিষ্ট এক ধরণের শ্রম নয়, বরং সেটা হল *বিমূর্ত* শ্রম, সাধারণভাবে মানুষের শ্রম। কোন নির্দিষ্ট সমাজের সমস্ত পণ্যের মোট মূল্যস্বরূপ মোট শ্রমশক্তি হল এই এক ও অভিন্ন মনুষ্য শ্রমশক্তিঃ কোটি কোটি বিনিময়ের ঘটানায় তার প্রমাণ মিলবে। সুতরাং নির্দিষ্ট প্রত্যেকটি পণ্যই হল *সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয়* শ্রম সময়ের এক একটা নির্দিষ্ট অংশ মাত্র। মূল্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয় সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ দিয়ে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট পণ্যটি, নির্দিষ্ট ব্যবহার মূল্যটির উৎপাদনে যেটুকু শ্রম সময় সামাজিকভাবে আবশ্যক, সেই শ্রম সময় দিয়ে। "বিনিময় মারফত ভিন্ন ভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্যের সমীকরণ করতে গিয়ে লোকে সেসব জিনিসের উপর প্রযুক্ত নিজেদের বিভিন্ন ধরণের শ্রমেরও পরস্পর সমীকরণ করে। এ সম্পর্কে তারা সচেতন থাকেনা বটে, কিন্তু করে এইটাই" (কার্ল মার্কস, পুঁজি, ১ম খন্ড, ১ম অধ্যায়, পণ্য, ৪র্থ পরিচ্ছেদঃ পণ্যপুঁজা ও তার রহস্য)। জনৈক পূর্বতন অর্থনীতিবীদের কথা অনুসারে মূল্য হল দুই ব্যক্তির মধ্যে একটা সম্পর্ক; ভাল হত যদি তিনি যোগ করতেন, সামগ্রীর আবরণে ঢাকা সম্পর্ক। মূল্য কী তা বোঝা যাবে শুধু তখনই, যখন আমরা তার বিচার করব সমাজের একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বিন্যাসের সামাজিক উৎপাদন সম্পর্ক ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, যেখানে এই উৎপাদন সম্পর্কগুলিও আবার আত্মপ্রকাশ করছে কোটি কোটি বার পুনরাবর্তিত ব্যাপক বিনিময় ঘটনার মধ্যে। "মূল্য হিসাবে দেখলে পণ্য হল কেবল নির্দিষ্ট পরিমানের একটা ঘণীভূত শ্রম সময়" (*কার্ল মার্কস, "অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে"*)। পণ্যে নিহিত শ্রমের দ্বিবিধ চরিত্রের বিস্তারিত বিশ্লেষণের পর মার্কস *মূল্যের রূপ* ও *অর্থের* বিশ্লেষণ করেছেন। এ গবেষণায় তাঁর প্রধান কাজ মূল্যের অর্থরূপের অধ্যয়ন, বিনিময়ের *ঐতিহাসিক বিকাশধারার* অধ্যয়ন, বিনিময়ের বিচ্ছিন্ন আপতিক ঘটনা থেকে ('মূল্যের সরল, বিচ্ছিন্ন অথবা আপতিক রূপ'—বিশেষ পরিমাণের কোন একটি পণ্য বিনিময় হচ্ছে আর একটি পণ্যের বিশেষ একটি পরিমাণের সঙ্গে) শুরু করে মূল্যের সার্বজনীন রূপ, যখন ভিন্ন ভিন্ন নানারকম পণ্যগুলিকে বিনিময় করা যায়

বিশেষ একটি নির্দিষ্ট পণ্যের সঙ্গে, এবং তা থেকে মূল্যের অর্থরূপ পর্যন্ত অধ্যয়ন, যখন সোনা হল সেই বিশেষ পণ্য, সার্বজনীন তুল্যমূল্য। বিনিময় ও পণ্য উৎপাদনের বিকাশের উচ্চতম ফল হল অর্থ; অর্থ ব্যক্তিগত শ্রমের সামাজিক চরিত্র ও বাজারের মারফত সংযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদকের সামাজিক সম্পর্ক ঢেকে গোপন করে রাখে। অর্থের কী কী কাজ সে বিষয় অতি বিস্তারিতভাবে মার্কস বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বিশেষ জরুরী যে, এখানেও ('পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম দিককার সমস্ত পরিচ্ছেদের মত) বিমূর্ত এবং আপাতদৃষ্টে প্রায়ই অবরোহমূলক পদ্ধতির উপস্থাপন আসলে বিনিময় ও পণ্য উৎপাদনের বিকাশের ইতিহাস থেকে সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ তথ্যের উপর নির্ভর করেই রচিত। 'অর্থ বললেই পণ্য বিনিময়ের একটা নির্দিষ্ট স্তর ধরে নিতে হয়। অর্থের কোন কাজটা কী কী পরিমাণে সাধিত হচ্ছে, তুলনামূলকভাবে তাদের কোনটার প্রাধান্য ঘটছে তার উপর নির্ভর করে অর্থের বিভিন্ন রূপ যথা পণ্যের সরল তুল্যমূল্য অথবা সঞ্চালনের মাধ্যমই হোক, আর লেনদেনের মাধ্যম, ধনরত্ন অথবা সার্বজনীন মুদ্রাই হোক তা সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার অতি বিভিন্ন সব স্তর সূচিত করে' ('পুঁজি', প্রথম খণ্ড)।

উদ্বৃত্ত মূল্য

পণ্য উৎপাদনের একটা বিশেষ স্তরে অর্থ রূপান্তরিত হয় পুঁজিতে। পণ্য সঞ্চালনের সূত্র ছিলঃ প—অ—প (পণ্য—অর্থ—পণ্য), অর্থাৎ একটি পণ্য ক্রয়ের জন্যে অন্য পণ্য বিক্রয়। পক্ষান্তরে পুঁজির সাধারণ সূত্র হলঃ অ—প—অ, অর্থাৎ বিক্রয়ের জন্য ক্রয় (মুনাফায়)। সঞ্চালনে ঢালা আদি অর্থ মূল্যের এই বৃদ্ধিটাকে মার্কস বলেছেন উদ্বৃত্ত মূল্য। পুঁজিবাদী সঞ্চালন ব্যবস্থায় অর্থের এই 'বৃদ্ধির' ঘটনাটা সুপরিচিত। এই 'বৃদ্ধিটাই' অর্থকে ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট বিশেষ একটি সামাজিক উৎপাদন সম্পর্ক হিসাবে *পুঁজিতে* পরিণত করে। পণ্য সঞ্চালন থেকে উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হতে পারেনা, কেননা পণ্য সঞ্চালনে শুধু সমতুল্য মূল্যেরই বিনিময় ঘটে থাকে;

দর বাড়িয়ে দিলেও উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হতে পারেনা, কেননা ক্রেতা ও বিক্রেতাদের পারস্পরিক লাভ লোকসান কাটাকাটি হয়ে যাবে; অথচ এক্ষেত্রে প্রশ্নটা ব্যক্তিগত নয়, বরং গড়পড়তা, ব্যাপক ও সামাজিক একটা ঘটনা নিয়ে। উদ্বৃত্ত মূল্য পেতে হলে "অর্থের মালিককে অবশ্যই বাজারে এমন একটি পণ্য বের করতে হবে, যার ব্যবহার মূল্যটাই মূল্যের উৎস হবার মত একটা স্বকীয় গুণ রাখে" (কার্ল মার্কস, পুঁজি, ১ম খন্ড) — এমন একটি পণ্য যাকে ভোগ করার প্রক্রিয়াই হল একইসাথে মূল্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া। এরকম পণ্য কিন্তু সত্যিই আছে, আর তা হল মানুষের শ্রমশক্তি। তার ভোগ মানে শ্রম, আর শ্রমই মূল্য সৃষ্টি করে। অর্থের মালিক শ্রমশক্তিকে কেনে তার মূল্য দিয়ে, অন্যান্য পণ্যের মূল্যের মতই এ মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে তার উৎপাদনের জন্য সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম সময় থেকে (অর্থাৎ সপরিবারে শ্রমিকের ভরণপোষণের খরচ থেকে)। শ্রমশক্তি ক্রয় করার পর অর্থের মালিক তা ভোগ করার, অর্থাৎ সারাদিনের জন্য ধরা যাক বারো ঘন্টার জন্য, তাকে খাটাবার অধিকার অর্জন করে। অথচ নিজের ভরণপোষণের খরচা তোলার মত উৎপাদন শ্রমিক তৈরি করছে ছয় ঘন্টার মধ্যেই ('প্রয়োজনীয়' শ্রমসময়) এবং ছয় ঘন্টায় ('উদ্বৃত্ত' শ্রমসময়) সে তৈরি করছে 'উদ্বৃত্ত' উৎপাদন, অথবা উদ্বৃত্ত মূল্য, যার জন্য পুঁজিপতি কোন দাম দেয়নি। অতএব, উৎপাদন প্রক্রিয়ার দিক থেকে দেখলে, পুঁজিকে দুভাগে ভাগ করে দেখতে হবেঃ স্থির পুঁজি, যা ব্যয় হচ্ছে উৎপাদনের উপায়সমূহের পেছনে (যন্ত্রপাতি, শ্রমের হাতিয়ার, কাঁচামাল ইত্যাদি), এ পুঁজির মূল্যে কোন বদল না হয়ে তা সম্পূর্ণরূপে (একসঙ্গে অথবা ভাগে ভাগে) উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে এসে জমা হয়; এবং পরিবর্তনশীল পুঁজি, যা ব্যয় হয় শ্রমশক্তির জন্য। শেষোক্ত পুঁজির মূল্য অপরিবর্তনীয় থাকেনা, শ্রমপ্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে তা বাড়ে এবং সৃষ্টি করে উদ্বৃত্ত মূল্য। সুতরাং পুঁজি কর্তৃক শ্রমশক্তি শোষণের মাত্রা প্রকাশ করতে হলে উদ্বৃত্ত মূল্যের সঙ্গে পুরো পুঁজির তুলনা না করে তুলনা করতে হবে কেবল পরিবর্তনশীল পুঁজির।

এ হিসেবে, পূর্বোক্ত উদাহারণে এই অনুপাত, মার্কস যার নাম দিয়েছেন উদ্বৃত্ত মূল্যের হার, হবে ৬-৬, অর্থাৎ শতকরা ১০০ ভাগ।

পুঁজি সৃষ্টির ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত হয়, প্রথমত, সাধারণভাবে পণ্য উৎপাদনের তুলনামূলক উচ্চস্তরে ব্যক্তি বিশেষের হাতে কিছু পরিমাণ অর্থ সঞ্চয়, এবং দ্বিতীয়ত, এমন শ্রমিকের অস্তিত্ব যে উভয় অর্থে 'মুক্ত': শ্রমশক্তি বিক্রয়ের পথে সবরকমের বাধা, বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত এবং জমি ও সাধারণভাবে উৎপাদনের সকল উপায় থেকেও মুক্ত, কোন প্রভুর সাথে বাঁধা নয়, সে হল 'সর্বহারা', নিজ শ্রমশক্তি বিক্রী ছাড়া যার জীবিকানির্বাহের উপায় নেই।

উদ্বৃত্ত মূল্য বাড়িয়ে তোলার দুটি প্রধান পদ্ধতি আছেঃ শ্রমদিনের দৈর্ঘ্য বাড়ানো (অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য) অথবা প্রয়োজনীয় শ্রমসময় কমানো (আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য)। প্রথম পদ্ধতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মার্কস শ্রমদিবসের ঘন্টা কমাবার জন্যে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম এবং অন্যদিকে শ্রমদিবসের ঘন্টা বাড়ানো (চৌদ্দ থেকে সতের শতক) এবং কমানোর (ঊনিশ শতকের কারখানা আইন) জন্য সরকারী হস্তক্ষেপের এক বিপুল চিত্র উন্মোচিত করেছেন। *পুঁজির* আবির্ভাবের পর পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস থেকে হাজার হাজার নতুন তথ্যে সে চিত্র পূর্ণতর হয়ে উঠেছে।

আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্যের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মার্কস তিনটি প্রধান ঐতিহাসিক পর্যায়ের আলোচনা করেছেন, যার ভেতর দিয়ে পুঁজিবাদ শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়েছেঃ ১। সরল সমবায় ২। শ্রমবিভাগ ও হস্তশিল্প কারখানা ৩। যন্ত্রপাতি ও বৃহদাকার শিল্প। পুঁজিবাদী বিকাশের বনিয়াদি ও বৈশিষ্ট্য-সূচক দিকগুলির যে কী গভীর বিশ্লেষণ মার্কস এখানে করেছেন তা, প্রসঙ্গত, বোঝা যাবে এই থেকে যে, রাশিয়ার কুটির শিল্প বলে যা পরিচিত তার অনুসন্ধান থেকে উল্লেখিত তিনটির প্রথম দুটি পর্যায়ের উদাহারণস্বরূপ প্রচুর তথ্য মিলেছে।

আর বৃহদাকার যন্ত্রশিল্পের বিপ্লবী প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে ১৮৬৭ সালে মার্কস যা বর্ণনা করেছিলেন, তা পরবর্তী অর্ধশতাব্দীর মধ্যে রাশিয়া, জাপান ইত্যাদির মত বেশ কিছু 'নতুন' দেশে দেখা গেছে।

আরো কথা আছে। *পুঁজির সঞ্চয়,* অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা অংশের পুঁজিতে রূপান্তর, পুঁজিপতির ব্যক্তিগত প্রয়োজন অথবা খেয়ালখুশি মেটাবার জন্যে ব্যবহার না করে নতুন উৎপাদনের জন্যে তার ব্যবহার, এই বিষয়ে মার্কসের বিশ্লেষণ অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অভিনব। এডাম স্মিথ থেকে শুরু করে আগেকার সমস্ত ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতি যে মনে করত যে পুঁজিতে রূপান্তরিত উদ্বৃত্ত মূল্যের সবখানিই যায় পরিবর্তনশীল পুঁজিতে, মার্কস তার ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে সেটা *উৎপাদনের উপায়* এবং পরিবর্তনশীল পুঁজি এই দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। মোট পুঁজির ভেতরে পরিবর্তনশীল পুঁজির অংশটার তুলনায় স্থির পুঁজির অংশটার দ্রুততর বৃদ্ধি পুঁজিবাদের বিকাশ প্রক্রিয়া এবং সমাজতন্ত্রে তার রূপান্তরের পক্ষে অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ।

পুঁজির সঞ্চয় শ্রমিকের বদলে যন্ত্র নিয়োগ করার গতিকে ত্বরান্বিত করে, এক প্রান্তে ধনসম্পদ আর অন্য প্রান্তে দারিদ্র্য সৃষ্টি করে, গড়ে তোলে তথাকথিত 'শ্রমের মজুত বাহিনী', শ্রমিকদের 'আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত', অথবা 'পুঁজিবাদী অতি জনসংখ্যা', যা বিভিন্ন বিচিত্র রূপে প্রকাশ পায় এবং পুঁজিকে অসাধারণ দ্রুত হারে উৎপদনের প্রসার ঘটাবার সুযোগ করে দেয়। প্রসঙ্গত, এই সম্ভাবনা এবং সেই সঙ্গে ক্রেডিট (জমা) ও উৎপাদনের উপায়রূপে পুঁজির যে সঞ্চয়—তা থেকে অতি উৎপাদন সংকট বোঝার সূত্র পাওয়া যাবে, যা পুঁজিবাদী দেশে প্রথমে দেখা দিত পর্যায়ক্রমে গড়ে প্রতি দশ বছর অন্তর, এবং পরে ঘটছে আরো দীর্ঘ সময় ধরে ও কম সুনির্দিষ্ট ব্যবধানে। পুঁজিবাদের ভিত্তিতে পুঁজির যে সঞ্চয় তা থেকে আলাদা করে দেখতে হবে তথাকথিত আদি সঞ্চয়ঃ উৎপাদনের উপায় থেকে জোর করে শ্রমিকের বিচ্ছেদ,

জমি থেকে কৃষককে বিতাড়ন, গ্রামগোষ্ঠীর জমি চুরি, উপনিবেশ ব্যবস্থা, জাতীয় ঋণ, সংরক্ষণ শুল্ক ইত্যাদি। 'আদি সঞ্চয়' থেকে সৃষ্টি হয় এক প্রান্তে 'মুক্ত' সর্বহারা আর অন্য প্রান্তে টাকার মালিক পুঁজিপতির।

*'পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের ঐতিহাসিক প্রবণতা'*য় মার্কস নিম্নলিখিত সুবিখ্যাত কথায় বর্ণনা করেছেনঃ 'সাক্ষাত উৎপাদকদের উচ্ছেদ কার্য সম্পন্ন করা হয় নৃশংসতম বর্বরতার মধ্য দিয়ে এবং জঘন্যতম, কদর্যতম, তুচ্ছ ও ঘৃণ্যতম প্রবৃত্তির তাড়নায়। 'মালিকের' (কৃষক ও হস্তশিল্পীদের) "শ্রমোপার্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আলাদা আলাদা স্বাধীন মেহনতকারীদের সঙ্গে তাদের শ্রমের হাতিয়ার ও উপায়সমূহের বলা যায় একীভূতকরণের ওপর ভিত্তি করে যা গড়ে উঠেছিল, তার স্থান গ্রহণ করে পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি, নামেই স্বাধীন, অন্যের শ্রমের শোষণের উপর যার ভিত্তি।... এবার স্বাধীন শ্রমিক যে নিজের জন্য কাজ করছে তাদেরকে নয়, বহু শ্রমিকদের শোষণ করছে এমন পুঁজিপতিদেরই উচ্ছেদ করার পালা। এ উচ্ছেদ সম্পন্ন হয় পুঁজিবাদী উৎপাদনের অন্তর্নিহিত নিয়মগুলির ক্রিয়া অনুসারেই, পুঁজির কেন্দ্রীভবনের মধ্য দিয়ে। অনেক পুঁজিপতিকে ঘায়েল করে একজন পুঁজিপতি। এই কেন্দ্রীভবন অথবা অল্প পুঁজিপতি কর্তৃক বহু পুঁজিপতিকে উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে আরো বিস্তারিত, বৃহৎ আকারে বিকশিত হতে থাকে শ্রমপ্রক্রিয়ার সমবায়মূলক রূপ, সচেতনভাবে বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত প্রয়োগ, ভুমির পরিকল্পিত চাষাবাদ, উৎপাদনের হাল হাতিয়ারগুলির এমন রূপান্তর যাতে তা শুধু যৌথভাবেই ব্যবহার করা সম্ভব, যৌথ সামাজিকীকৃত শ্রমের উৎপাদনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে উৎপাদনের সমস্ত উপায়সমূহের অপচয় নিরোধ, বিশ্ববাজারের জালে সমস্ত জনগণের বিজড়ন আর সেই সঙ্গে পুঁজিবাদী শাসনের আন্তর্জাতিক চরিত্র অর্জন। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার সব সুবিধা যারা বেদখল করছে, একচেটিয়া করে নিচ্ছে, পুঁজির সেইসব রাঘব বোয়ালদের সংখ্যা ক্রমাগত কমার সঙ্গে সঙ্গে

বাড়তে থাকে দারিদ্র্য, নিপীড়ন, দাসত্ব, অধপতন ও শোষণের ব্যাপকতা; কিন্তু তার সঙ্গেই বাড়তে থাকে শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্রোহ, পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যারা সংখ্যায় অব্যাহতভাবে বাড়ছে আর শিক্ষিত, ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হয়ে উঠছে। পুঁজির একচেটিয়া অধিকার সেই উৎপাদন পদ্ধতির পথেই একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায় যা তার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিয়েছে আর তার অধীনেই বেড়ে উঠেছে। উৎপাদন উপায়ের কেন্দ্রীভবন এবং শ্রমের সামাজীকরণ শেষ পর্যন্ত এমন একটা মাত্রায় গিয়ে পৌঁছে যখন তার সঙ্গে আর পুঁজিবাদী খোসাটা খাপ খায়না। খোসা ফেঁটে যায়। পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানার মৃত্যুঘন্টা বাজে। উচ্ছেদ করা হয় উচ্ছেদকারীদের" (পুঁজি, প্রথম খণ্ড)।

আরো গুরুত্বপূর্ণ ও অভিনব হল মোট সামাজিক পুঁজির পুনরুৎপাদন বিষয়ে *পুঁজি* বইটির দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদত্ত মার্কসের বিশ্লেষণ। এক্ষেত্রেও মার্কস একক ঘটনা না নিয়ে ব্যাপক ঘটনা নেন, সমাজের অর্থনীতির একটা ভগ্নাংশ না নিয়ে সমগ্রভাবে পুরো অর্থনীতিটাকেই বিচার করেন। পূর্বোক্ত ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের ভ্রান্তি সংশোধন করে মার্কস সমগ্র সামাজিক উৎপাদনকে ভাগ করেছেন দুটি প্রধান ভাগেঃ ১। উৎপাদনের উপায়ের উৎপাদন ২। ভোগ্য বস্তুর উৎপাদন; এবং পূর্বপরিমাণে পুনরুৎপাদন ও সঞ্চয় এই উভয় ক্ষেত্রেই সমস্ত সামাজিক পুঁজির মোট সঞ্চালন বিষয়ে সংখ্যাগত দৃষ্টান্ত তুলে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। *পুঁজি* বইটির তৃতীয় খণ্ডে *মুনাফার গড় হার* সৃষ্টির সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে মূল্যের নিয়মকে ভিত্তি করে। অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্কস যে বিরাট অগ্রগতি ঘটিয়েছেন সেটা এইখানে যে, স্থূল রাজনৈতিক অর্থনীতি অথবা সাম্প্রতিক 'প্রান্তিক উপযোগিতার তত্ত্ব' (শ্রম মূল্যের মার্কসীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে তথাকথিত অস্ট্রীয় মতধারা এ তত্ত্ব পেশ করে ঊনিশ শতকের শেষে। এই স্কুল বিভিন্ন রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি রকমফের, তাদের থেকে পার্থক্য শুধু এই যে এতে পণ্যের মূল্য

নির্ণীত হয় সোজাসুজি তার উপযোগিতা দিয়ে নয়, নির্দিষ্ট মজুদ পণ্যটির শেষ প্রান্তিক একক উপযোগিতা দিয়ে যাতে মানুষের ন্যুনতম চাহিদা মিটছে। অস্ট্রীয় মতধারার সমস্ত অর্থনৈতিক ও দার্শনিক প্রতিপাদ্যের মত এ তত্ত্বেরও মূলকথা হল পুঁজিবাদী শোষণের চরিত্র ঝাপসা করা) যেভাবে বিচ্ছিন্ন ঘটনা অথবা প্রতিযোগিতার বাহ্যিক অগভীর দিকগুলিতে প্রায়শই সীমাবদ্ধ থাকে, মার্কস সেরকম কোন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ না করে তাঁর বিশ্লেষণ চালিয়েছেন ব্যাপক অর্থনৈতিক ঘটনার দৃষ্টিকোণ থেকে, সামাজিক অর্থনীতির সামগ্রিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে। মার্কস প্রথমে বিশ্লেষণ করেছেন কীভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হয় এবং তারপরে পর্যালোচনা করেছেন উদ্বৃত্ত মূল্য কীভাবে মুনাফা, সুদ ও ভুমি-খাজনায় ভাগ হয়ে যায়। মুনাফা হল উদ্বৃত্ত মূল্য ও কারবারে নিয়োযিত মোট পুঁজির অনুপাত। যে পুঁজির 'আঙ্গিক গঠন উঁচু' (অর্থাৎ পরিবর্তনশীল পুঁজির তুলনায় স্থির পুঁজির পরিমাণ যেখানে সামাজিক গড়পড়তা অনুপাতের চেয়ে বেশি) তার মুনাফার হার গড়পড়তা হারের চেয়ে কম; যে পুঁজির 'আঙ্গিক গঠন নিচু' তার মুনাফার হার গড়পড়তা হারের চেয়ে বেশি। বিভিন্ন ধরণের পুঁজির মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং এক শাখা থেকে অন্য শাখায় পুঁজির স্বাধীন চলাচলের ফলে উভয়ক্ষেত্রেই মুনাফার হার গড় হারের দিকে যায়। কোন একটি সমাজের সমস্ত পণ্যের মোট মুল্যের সঙ্গে সমস্ত পণ্যের মোট দাম মিলে যায়। কিন্তু প্রতিযোগিতার দরুন ভিন্ন ভিন্ন কারবারে এবং উৎপাদনের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় পণ্য তাদের যথাযথ মূল্যে বিক্রয় হয়না, বিক্রয় হয় উৎপাদনের দাম (অথবা উৎপাদনী দাম) অনুসারে। এটা হল ব্যয়িত পুঁজির সঙ্গে গড় মুনাফার যোগফল।

মূল্যের নিয়মকে ভিত্তি করে এইভাবে মার্কস মূল্য থেকে দামের বিচ্যুতি এবং মুনাফার সমতা বিষয়ক সুবিদিত ও তর্কাতীত ঘটনাটিকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করেছেন, কেননা সমস্ত পণ্যের মোট মূল্য তার মোট দামের সমান। (সামাজিক) মূল্যের সঙ্গে (ব্যক্তিমূলক) দামের সমীকরণ অবশ্য সরলভাবে ও সোজাসুজি হয়না,

হয় অতি জটিল এক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। যে সমাজে আলাদা আলাদা পণ্য উৎপাদকদের মধ্যে কেবলমাত্র বাজারের মারফতই মিলন সম্ভব, সেখানে খুবই স্বাভাবিক যে নিয়মবদ্ধতা শুধুমাত্র গড়পড়তা, সামাজিক, সমষ্টিগত নিয়মবদ্ধতা ছাড়া অন্য কোনভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনা, সেখানে বিশেষ এক একটা ক্ষেত্রের এদিক বা ওদিকের হেরফের পরস্পর কাটাকাটি হয়ে যায়।

শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির অর্থ হল পরিবর্তনশীল পুঁজির তুলনায় স্থির পুঁজির অধিকতর দ্রুত বৃদ্ধি। এবং উদ্বৃত্ত মূল্য যেহেতু সৃষ্টি হয় কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল পুঁজি থেকে, তাই একথা খুবই পরিষ্কার যে মুনাফার হার (শুধু পরিবর্তনশীল পুঁজির সঙ্গে নয়, সমগ্র পুঁজির সঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্যের অনুপাত) ক্রমশ কমে যাবার ঝোঁক দেখায়। এই ঝোঁক সম্পর্কে এবং যেসব পরিস্থিতিতে এই ঝোঁকটা ঢাকা থাকে অথবা বাধা পায় তাদের সম্পর্কে মার্কস বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। *পুঁজি* বইয়ের তৃতীয় খণ্ডে মহাজনী পুঁজি, বাণিজ্যিক পুঁজি ও অর্থ পুঁজি বিষয়ে অসাধারণ চিত্তাকর্ষক যেসব অধ্যায় আছে তার বিবরণ দেবার জন্যে না থেমে এবার সবচেয়ে প্রধান কথাটা, *ভূমি খাজনার* তত্ত্বে চলে আসা যাক। যেহেতু ভূমি ক্ষেত্রের পরিমাণ সীমাবদ্ধ এবং পুঁজিবাদী দেশে তার সবটুকুই ব্যক্তিগত মালিকের অধিকারে, সেহেতু গড় সাধারণ জমির ওপর উৎপাদনের যা খরচ তাই দিয়ে কৃষি উৎপাদনের দাম স্থির হয় না, স্থির হয় সর্বনিকৃষ্ট জমিতে উৎপাদনের খরচ দিয়ে, বাজারে সরবরাহের গড় অবস্থা নয়, বরং সর্বনিকৃষ্ট অবস্থাকে হিসেবে নিয়ে। বাজারে উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহের গড় দামের সঙ্গে উন্নততর জমিতে (কিংবা উন্নততর অবস্থাধীনে) উৎপাদন দামের যে পার্থক্য হয় তাই হল *আন্তর* খাজনা। এই বিষয়টা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে, এই আন্তর খাজনা কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিখণ্ডের উর্বরতার বিভিন্নতা থেকে, আর জমিতে যে পুঁজি বিনিয়োগ করা হচ্ছে তার পরিমাণের বিভিন্নতা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে তা দেখিয়ে মার্কস পুরোপুরি উদ্ঘাটন করেছেন (*'উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব'*ও দ্রষ্টব্য;

এখানে রদবের্তুসকে যে সমালোচনা করা হয়েছে তা বিশেষ করে লক্ষণীয়) রিকার্ডোর এই ভ্রান্তি যেন আন্তর খাজনার সৃষ্টি হয় কেবল ক্রমান্বয়ে ভালো জমি থেকে খারাপ জমিতে উত্তরণে। কিন্তু উল্টো দিকের উত্তরণও তো ঘটে, এক ধরনের জমি রূপান্তরিত হয় অন্য ধরনের জমিতে (কৃষি প্রযুক্তির অগ্রগতি, শহরের বৃদ্ধি ইত্যাদি কারনে); এবং 'ভূমির ক্রমক্ষয়িষ্ণু উর্বরতার' কুখ্যাত নিয়মটি হল গুরুতর ভ্রান্ত নিয়ম যা পুঁজিবাদের ত্রুটি, সীমাবদ্ধতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকৃতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। তার উপর, শিল্পের এবং সাধারণভাবে জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত শাখায় মুনাফার সমতাসাধন হতে হলে প্রতিযোগিতার পূর্ণ স্বাধীনতা এবং এক শাখা থেকে অন্য শাখায় পুঁজির অবাধ চলাচল ধরে নিতে হয়। কিন্তু জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার ফলে সৃষ্টি হয় একচেটিয়া অধিকার আর তাতে এই অবাধ চলাচল ব্যাহত হয়। কৃষি উৎপাদনের পুঁজির নিম্নতর আঙ্গিক গঠন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাই ব্যক্তিগতভাবে রয়েছে উচ্চতর মুনাফার হার; কিন্তু এই একচেটিয়া অধিকারের ফলে কৃষি উৎপাদন মুনাফার হারের সমতা-সাধনের পরিপূর্ণ স্বাধীন প্রক্রিয়াটির অন্তর্ভুক্ত হয় না। জমির মালিক একচেটিয়া অধিকারী হিসাবে গড়পড়তার চেয়ে বেশি দাম ধরার সুযোগ পায় আর এই একচেটিয়া দাম থেকেই জন্ম নেয় *অনাপেক্ষিক* খাজনা। পুঁজিবাদের আওতায় আন্তর খাজনার অবসান ঘটানো সম্ভব নয়, কিন্তু অনাপেক্ষিক খাজনার অবসান সম্ভব – যেমন জমির জাতীয়করণ হলে, রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে তার রূপান্তর ঘটলে। এইরূপে রূপান্তরের অর্থ হবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকের একচেটিয়া ধ্বংস এবং কৃষির ক্ষেত্রে অধিকতর নিয়মবদ্ধ ও পরিপূর্ণতর স্বাধীন প্রতিযোগিতার প্রয়োগ। এবং সেইজন্যেই, মার্কস বলেছেন, ইতিহাসে রেডিক্যাল বুর্শোয়ারা জমি জাতীয়করণের এই প্রগতিশীল বুর্শোয়া দাবিটিকে কম উপস্থিত করেনি, কিন্তু অধিকাংশ বুর্শোয়াই অবশ্য তাতে ভয় পেয়ে গেছে, কেননা তাতে অতিমাত্রায় 'স্পষ্ট হয়ে পড়ে' আমাদের কালের পক্ষে বিশেষ জরুরী ও 'স্পর্শকাতর' আরেক ধরণের একচেটিয়া অধিকারঃ সাধারণভাবে উৎপাদনের উপায়গুলির ওপর

একচেটিয়া অধিকার। (১৮৬২ সালের ২রা আগস্ট এঙ্গেলসের কাছে লেখা একটি পত্রে মার্কস পুঁজির ওপর মুনাফার গড় হার এবং পরম ভুমি খাজনা সম্পর্কে তাঁর তত্ত্বের একটি আশ্চর্য জনবোধ্য, সংক্ষিপ্ত ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'পত্রাবলী', তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ৭৭-৮১ দ্রষ্টব্য; ১৮৬২ সালের ৯ই আগস্টের পত্রটিও তুলনীয়, ঐ, পৃ ৮৬-৮৭) ভুমি খাজনার ইতিহাসের ক্ষেত্রেও মার্কসের বিশ্লেষণ অনুধাবন করা গুরুত্বপূর্ণ। মার্কস দেখিয়েছেন, কী করে শ্রম খাজনা (চাষী যখন জমিদারের জমিতে নিজের শ্রমে উদ্বৃত্ত উৎপাদন তৈরি করছে) রূপান্তরিত হচ্ছে ফসল বা দ্রব্যসামগ্রী হিসেবে প্রদত্ত খাজনায় (চাষী যখন তার নিজের জমিতে উদ্বৃত্ত উৎপাদন তৈরি করছে এবং জমিদারকে তা দিচ্ছে 'অর্থনীতি বহির্ভূত বাধ্যতার জন্য), তারপর অর্থ খাজনায় (দ্রব্যরূপে প্রদত্ত খাজনা পণ্য উৎপাদনের বিকাশের ফলে অর্থে পরিণৎ হয় যেমন, সেকালের রাশিয়ায় এই খাজনাকে বলা হত ওব্রোক) এবং পরিশেষে পুঁজিবাদী খাজনায়, যখন কৃষকের বদলে আসছে কৃষি উদ্যোক্তা যে চাষ চালাচ্ছে মজুরি শ্রমের সাহায্যে। 'পুঁজিবাদের ভুমি খাজনার উদ্ভবের' এই বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মার্কস কৃষিতে পুঁজিবাদের বিবর্তন সম্পর্কে যে কয়েকটি সুগভীর (এবং রাশিয়ার মত পশ্চাদবর্তী দেশগুলোর পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ) ধারণা দিয়ে গেছেন তা অনুধাবনযোগ্য। "দ্রব্য হিসেবে প্রদত্ত খাজনা যখন অর্থ খাজনায় রূপান্তরিত হয়, তখন তার অনিবার্য সহগামী শুধু নয়, এমনকি আগে থেকেই সৃষ্টি হয় সম্পত্তিহীন দিনমজুরের একটি শ্রেণী, যারা অর্থের বিনিময়ে ভাড়া খাটে। এই শ্রেণীটির উদ্ভবের পর্বে, যখন তাদের সবে এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে, তখন স্বভাবতই অবস্থাপন্ন খাজনা প্রদানকারী কৃষকদের মধ্যে নিজেদের কাজে কৃষি শ্রমিক শোষণ করার একটা রীতি বেড়ে উঠতে থাকে, ঠিক যেভাবে সামন্ত যুগে অবস্থাপন্ন ভুমিদাস চাষীরা নিজেরাও আবার ভূমিদাস রাখত। এইসব চাষীদের পক্ষে ক্রমে ক্রমে হাতে কিছু সম্পদ জমিয়ে ভবিষ্যত পুঁজিপতিতে পরিণত হওয়া সম্ভব হয়। স্বাধীনভাবে কৃষিকাজ চালানো আগেকার জমি মালিকদের মধ্যে থেকেই এইভাবে গড়ে উঠে পুঁজিপতি

দখলদারদের আঁতুড়ঘর, যাদের বিকাশ নির্ভর করছে কৃষি অঞ্চলের বাইরে পুঁজিবাদী উৎপাদনের সাধারণ বিকাশের ওপর" (*পুঁজি*, তৃতীয় খন্ড) (২৬)। "গ্রামবাসীদের একাংশের উচ্ছেদ ও গ্রাম থেকে বিতাড়নের ফলে শিল্প পুঁজির জন্যে শুধু যে শ্রমিক, শ্রমিকের জীবনধারণের উপায় ও তাদের শ্রমের হাতিয়ার 'মুক্ত হয়ে যায়' তাই নয়, আভ্যন্তরীণ বাজারও গড়ে উঠে" (*পুঁজি*, প্রথম খন্ড) (২৭)। কৃষিজীবী জনগণের দারিদ্র বৃদ্ধি ও ধ্বংস আবার পুঁজির জন্যে শ্রমের মজুত বাহিনী সৃষ্টিতে ভূমিকা নেয়। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই "তাই কৃষিজীবি জনগণের একাংশ অনবরত শহরের বা কারখানা এলাকার (অর্থাৎ কৃষিজীবি নয়) সর্বহারায় পরিণত হবার অবস্থায় থাকে। আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনতার এই উৎসটি অবিরাম প্রবহমান। ... গ্রাম্য মেহনতীকে নেমে আসতে হয় সর্বনিম্ন মাত্রার মজুরিতে, এক পা তার সবসময়ই ডুবে থাকে নিঃসতার পাঁকে" (*পুঁজি*, প্রথম খন্ড) (২৮)। কৃষক যে জমি চাষ করছে তাতে তার ব্যক্তিগত মালিকানা হল ছোট আকারের উৎপাদনের ভিত্তি, তার উন্নতি ও ধ্রুপদী রূপ পরিগ্রহের শর্ত। কিন্তু এ ধরণের ছোট আকার উৎপাদন খাপ খায় শুধু একটা অপরিসর আদিম ধাঁচের উৎপাদন ও সমাজের সঙ্গে। পুঁজিবাদের আওতায় কৃষকদের শোষণ শুধু *রূপেই* শিল্প শ্রমিকদের শোষণ থেকে ভিন্ন ধরণের। শোষক একইঃ *পুঁজি*। ব্যক্তি পুঁজিপতিরা ব্যক্তি কৃষকদের শোষন করে *বন্ধকী* ও *সুদী কারবার* মারফত; গোটা পুঁজিপতি শ্রেণী কৃষক শ্রেণীকে শোষণ করে সরকারী খাজনা মারফত" (*কার্ল মার্কস, ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম*)। "কৃষকদের ছোট আকারের সম্পত্তি এখন পুঁজিপতিদের পক্ষে জমি থেকে মুনাফা, সুদ ও খাজনা আদায়ের অসিলা মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে আর নিজের মজুরিটুকু কী করে তোলা যাবে তার ভার ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে জমি চাষ করে তার উপর" (*কার্ল মার্কস, লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার*)। একটা নিয়ম হিসেবে চাষীকে এমনকি তার নিজ মজুরির একটা অংশ পর্যন্ত পুঁজিবাদী সমাজের জন্যে, অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্যে ছেড়ে দিতে হয় এবং নিজেকে নামতে হয় "*আইরিশ প্রজাচাষীর* সমপর্যায়ে আর সমস্ত ব্যাপারটা

ঘটছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মালিক হওয়ার অসিলায়" (*কার্ল মার্কস, ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম*)। "যে দেশে ছোট আকারের চাষাবাদের আধিক্য সে দেশে শস্যের দাম, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি যে দেশে গ্রহণ করা হয়েছে সেখানকার শস্যের দামের চেয়ে যে কম হয়, তার অন্যতম কারণ" কী? (*কার্ল মার্কস, পুঁজি,* তৃতীয় খন্ড)। কারণ কৃষক তার উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্যের একাংশ বিনামূল্যে সমাজের হাতে (অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতে) ছেড়ে দেয়। 'সুতরাং শস্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের "এই নিচু দাম" হল উৎপাদকদের দারিদ্রের ফল, কোন ক্রমেই তাদের শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতার ফল নয়"। (*পুঁজি,* তৃতীয় খন্ড, পৃ ৩৪০)। ছোট আকারের উৎপাদনের স্বাভাবিক রূপ হল ছোট ভূমি মালিকানা যা পুঁজিবাদের আওতায় অধঃপতিত, বিলুপ্ত ও ধ্বংস হয়। "ছোট ভূমি মালিকানার প্রকৃতিটাই এমন যে তাতে শ্রমের সামাজিক উৎপাদন শক্তির বিকাশ, শ্রমের সামাজিক রূপ, পুঁজির সামাজিক পুঞ্জীভবন, বৃহদাকারে গবাদি পশুপালন এবং বিজ্ঞানের প্রগতিশীল প্রয়োগ সম্ভব নয়। সুদী কারবার ও কর ব্যবস্থার ফলে সর্বত্রই তার নিঃস্বভবন অনিবার্য। জমি কেনার জন্যে পুঁজি ব্যয়ের ফলে সে পুঁজি জমি চাষাবাদ থেকে বাদ পড়ে। উৎপাদন উপায়ের অশেষ বিভক্তিকরণ এবং খোদ উৎপাদকদেরই বিচ্ছিন্নতা"। (সমবায়, অর্থাৎ ছোট চাষীদের সমিতিগুলি অসাধারণ প্রগতিশীল বুর্শোয়া ভূমিকা পালন করলেও তাতে করে এ ঝোঁকটা দুর্বল হয় মাত্র, একেবারে বন্ধ হয়না; একথাও ভুললে চলবেনা যে অবস্থাপন্ন কৃষকদের জন্য সমবায় অনেক কিছু করলেও গরীব চাষীদের ব্যাপক অংশের জন্যে যৎসামান্য করে, প্রায় কিছুই করেনা। তাছাড়া পরে সমবায় সমিতিগুলি মজুরিশ্রমের শোষক হয়ে বসে) "মানুষের শক্তির বিপুল অপচয়। টুকরো মালিকানার নিয়মই হল উৎপাদন অবস্থার ক্রমিক অবনতি, এবং উৎপাদন উপায়ের ক্রমিক বৃদ্ধি" (*কার্ল মার্কস, পুঁজি, ৩য় খণ্ড*)। যেমন শিল্পে তেমনি কৃষিতেও পুঁজিবাদ উৎপাদন প্রক্রিয়ার রূপান্তর ঘটায় শুধু "উৎপাদককে শহীদ বানিয়ে"। "অনেকখানি জায়গায় ছড়িয়ে থাকার দরুন গ্রাম্য শ্রমিকদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে পড়ে,পৃ ৫০

আবার পুঞ্জীভবনের ফলে শহুরে শ্রমিকদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যেমন আধুনিক শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে, তেমনি সাম্প্রতিক পুঁজিবাদী কৃষি ব্যবস্থাতেও শ্রমের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি এবং তার বিপুল সচলতা অর্জন করা হয় শ্রমশক্তিকেই ধ্বংস ও শীর্ণ করে তোলার বিনিময়ে। অধিকন্তু, পুঁজিবাদী কৃষির যা কিছু প্রগতি তা হল শুধু শ্রমিককে নয় ভূমিকেও লুঠ করার কৌশলের প্রগতি। ... সুতরাং পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রযুক্তিবিদ্যা এবং উৎপাদনের সকল সামাজিক প্রক্রিয়ার সম্মিলনের বিকাশ ঘটায় কেবল এমন পথে যাতে একই সঙ্গে সর্বসম্পদের মূলাধার ভূমি ও শ্রমিকদেরও বিধ্বস্ত করা হয়" (*পুঁজি,* ১ম খন্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদের শেষ ভাগ)।

সমাজতন্ত্র

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাবে যে পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তর যে অনিবার্য এ সিদ্ধান্ত মার্কস পুরোপুরি ও একমাত্র টেনেছেন সমকালীন সমাজের গতির অর্থনৈতিক নিয়ম থেকেই। শ্রমের যে সামাজিকীকরণ হাজার হাজার রূপের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং মার্কসের মৃত্যুর পর যে অর্ধশতাব্দী কেটে গেল, তার ভেতর বৃহদাকার উৎপাদন, পুঁজিবাদী কার্টেল, সিন্ডিকেট ও ট্রাস্টের বৃদ্ধিতে তথা লগ্নী পুঁজির পরিমাণ ও ক্ষমতার প্রচণ্ড বৃদ্ধির মধ্যে যা বিশেষ স্পষ্ট করে আত্মপ্রকাশ করছে, তাই হল সমাজতন্ত্রের অনিবার্য অভ্যুদয়ের প্রধান বস্তুগত ভিত্তি। এ রূপান্তরের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক চালিকাশক্তি এবং বাস্তব কর্মকর্তা হল সর্বহারা শ্রেণী, পুঁজিবাদই তাদের শিক্ষিত করে তোলে। বুর্শোয়ার বিরুদ্ধে সর্বহারাশ্রেণীর যে সংগ্রাম বহুবিচিত্র ও উত্তরোত্তর সারসমৃদ্ধ রূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে তা অনিবার্যভাবেই পরিণত হয় এক রাজনৈতিক সংগ্রামে, সর্বহারা শ্রেণী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলই যার লক্ষ্য (সর্বহারা একনায়কত্ব)। উৎপাদনের সামাজিকীকরণ উৎপাদনের উপায়সমূহকে সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত না করে, "উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ" না ঘটিয়ে পারেনা। এরূপ পরিণতির

সরাসরি ফল হবে শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতার বিপুল বৃদ্ধি, শ্রমদিনের হ্রাস, আদিম প্রকৃতির ছোট ছোট বিখন্ডিত উৎপাদনের অবশেষগুলির, ধ্বংসস্তুপগুলির স্থানে যৌথ ও উন্নততর শ্রম, এমনই হল এই রূপান্তরের প্রত্যক্ষ ফলাফল। কৃষি ও শিল্পের যোগাযোগ পুঁজিবাদের ফলে চূড়ান্তভাবে ছিন্ন হয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার উচ্চতম বিকাশের ফলে বিজ্ঞানের সচেতন প্রয়োগ, যৌথ পরিশ্রমের প্রণালী এবং জনসংখ্যার পুনর্বিন্যাসের ভিত্তিতে তা গড়ে তোলে এই বন্ধনের, শিল্পের সাথে কৃষি মিলনের নতুন উপকরণ (এই পুনর্বিন্যাসে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের যোগাযোগহীনতা, বিচ্ছিন্নতা ও বর্বরতা, আর বড় বড় শহরের বিপুল জনসংখ্যার অস্বাভাবিক পুঞ্জীভবনের অবসান হবে)। আধুনিক পুঁজিবাদের উচ্চতম রূপের ফলে পরিবারের নতুন রূপ, নারীদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং নতুন প্রজন্মকে মানুষ করে তোলার ক্ষেত্রে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে চলেছেঃ নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের শ্রম, পুঁজিবাদ কর্তৃক পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের ভাঙন আধুনিক সমাজে অবশ্যই ভয়াবহতম, বিপর্যয়কর ও জঘন্য রূপ নেয়। কিন্তু তাহলেও "বৃহৎ শিল্প নারী, কিশোর ও বালকবালিকাদের জন্যে তাদের গার্হস্থ্য জীবনের বাইরে উৎপাদনের সামাজিক প্রক্রিয়ায় নির্ধারক ভূমিকা অর্পণ করে পরিবার ও নরনারী সম্পর্কের একটা উচ্চতর রূপের নতুন অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলে। বলা বাহুল্য, পরিবারের খৃষ্টীয় জার্মান রূপটিকে পরম বলে গণ্য করা অথবা তার প্রাচীন রোম, গ্রীক বা প্রাচ্যদেশীয় রূপকেই পরম গণ্য করা সমান বোকামি। তার উপর, পরস্পর যোগাযোগে এরা হল একটি একক ঐতিহাসিক বিকাশধারা। একথা পরিষ্কার যে স্বতস্ফূর্তভাবে বিকশিত কদর্য পুঁজিবাদী রূপের ক্ষেত্রে, যেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য শ্রমিকের অস্তিত্ব, শ্রমিকের জন্যে উৎপাদন প্রক্রিয়া নয়, সেখানে নরনারী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকে নিয়ে যৌথ শ্রমিক বাহিনী গঠন দুর্নীতি ও দাসত্বের সংক্রামক জন্মস্থল হলেও উপযুক্ত অবস্থায় অবধারিতভাবেই তা বরং মানবোচিত বিকাশের উৎস হতে বাধ্য" (পুঁজি, ১ম খন্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদের শেষ)। কারখানা ব্যবস্থায় দেখি "ভবিষ্যত যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার বীজ,

যখন নির্দিষ্ট বয়সের পরে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের জন্যেই উৎপাদনশীল শ্রমের সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা ও শরীরচর্চার মিলন ঘটবে, সামাজিক উৎপাদন বাড়াবারই একটা উপায় হিসেবে মাত্র নয়, পুরোপুরি বিকশিত মানুষ গড়ে তোলার একমাত্র পদ্ধতি হিসাবে" (ঐ)। জাতীয় সমস্যা ও রাষ্ট্রের প্রশ্নটিকেও এই একই ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমির উপর দাঁড় করায় মার্কসের সমাজতন্ত্র এবং তা শুধু অতীতকে ব্যাখ্যা করার দিক থেকে নয়, নির্ভয় ভবিষ্যতবাণী করে সে ভবিষ্যত রূপায়িত করার লক্ষ্যে সাহসী ব্যবহারিক কার্যকলাপের দিক থেকেও। সামাজিক বিকাশধারায় বুর্শোয়া যুগের একটি অনিবার্য ফল ও রূপ হল জাতি। "নিজেকে *জাতি* হিসেবে গঠণ না করে", 'জাতীয়' না হয়ে ("কথাটা মোটেই বুর্শোয়ারা অর্থে নয়") শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে শক্তি সঞ্চয় করা, পরিণত হওয়া, গঠিত হওয়া সম্ভব ছিলনা। কিন্তু পুঁজিবাদের বিকাশে জাতীয় গন্ডি ক্রমেই বেশি করে ভাঙতে থাকে, জাতীয় বিচ্ছিন্নতার অবসান হয় এবং জাতি বৈরিতার বদলে দেখা যায় শ্রেণীবৈরিতা। সুতরাং, বিকশিত পুঁজিবাদী দেশের ক্ষেত্রে একথা পুরোপুরি সত্য যে, "শ্রমজীবিদের দেশ নেই" এবং অন্ততপক্ষে সুসভ্য দেশগুলির শ্রমিকদের "মিলিত প্রচেষ্টাই" হল "সর্বহারাশ্রেণীর মুক্তির অন্যতম প্রথম শর্ত" (*কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস, সাম্যবাদী ইশতেহার*)। রাষ্ট্র হল সংগঠিত বলপ্রয়োগ, তার উদ্ভব হয় সমাজ বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে যখন সমাজ আপোসহীন শ্রেণীতে ভাগ হয়ে পড়ে, যখন বাহ্যত সমাজের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এবং সমাজ থেকে কিছু পরিমানে স্বতন্ত্র একটা 'কর্তৃত্ব' ছাড়া সমাজ টিকতে পারছেনা। শ্রেণীবিরোধের মধ্যে থেকে উদ্ভূত হয়ে রাষ্ট্র হয়ে পড়ে "সবচেয়ে শক্তিশালী ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্যকারী শ্রেণীর রাষ্ট্র, এই শ্রেণী রাষ্ট্রের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রেও আধিপত্যকারী শ্রেণী হয়ে উঠে এবং তার ফলে নিপীড়িত শ্রেণীর উপর দমন ও শোষণ চালানোর নতুন হাতিয়ার লাভ করে। এইভাবে প্রাচীন যুগে রাষ্ট্র ছিল সর্বোপরি ক্রীতদাসের দমনের জন্যে দাসমালিকদের রাষ্ট্র, যেমন সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল ভূমিদাস কৃষকদের বশে রাখার জন্যে অভিজাতদের সংস্থা এবং

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র হচ্ছে পুঁজি কর্তৃক মজুরি শ্রম শোষণের হাতিয়ার'। (*ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস, পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি,* যেখানে তিনি নিজের ও মার্কসের মত উপস্থিত করেছেন) যে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বুর্শোয়া রাষ্ট্রের সবচেয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতামূলক, সবচেয়ে প্রগতিশীল রূপ সেখানেও এ ব্যাপারটা এতটুকু মোছেনা, বদলায় শুধু তার রূপ (সরকার ও শেয়ার বাজারের মধ্যে সম্পর্ক, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সংবাদপত্র ও সরকারী কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে কেনা ইত্যাদি)। সমাজতন্ত্র শ্রেণীর বিলোপ ঘটিয়ে বিলোপ ঘটায় রাষ্ট্রের। 'দ্যুরিংয়ের বক্তব্য খণ্ডন' বইয়ে এঙ্গেলস লিখেছেন, "প্রথম যে কাজটা করে রাষ্ট্র সত্যসত্যই সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে এগিয়ে আসে— সমগ্র সমাজের নামে উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা দখল করা—সেই হবে যুগপৎ রাষ্ট্র হিসেবে তার শেষ স্বাধীন কাজ। সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ক্রমেই একের পর এক ক্ষেত্রে অবান্তর হয়ে উঠতে থাকবে ও নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যক্তিদের প্রশাসনের বদলে আসে বস্তুর প্রশাসন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ। রাষ্ট্রের 'উচ্ছেদ হবেনা', শুকিয়ে মরবে"। "উৎপাদকদের স্বাধীন ও সমান সম্মিলনের ভিত্তিতে যে সমাজ উৎপাদনকে সংগঠিত করবে, সে সমাজ সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে পাঠিয়ে দেবে তার যোগ্যস্থানেঃ পুরাতত্ত্বের যাদুঘরে, চরকা ও ব্রোঞ্জের কুড়ালের পাশে" (*ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস, পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উদ্ভব*)।

পরিশেষে, উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ করার যুগেও যে ছোট চাষীরা থেকেই যাবে, তাদের প্রতি মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের মনোভাব সম্পর্কিত এঙ্গেলসের একটি উক্তির উল্লেখ করা প্রয়োজন, যাতে তিনি মার্কসের মতামতই উপস্থিত করেছেনঃ "আমরা যখন রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করব তখন ছোট কৃষকদের জোর করে উৎখাত (ক্ষতিপূরণসহ বা বিনা ক্ষতিপূরণে) করার কথা চিন্তায়ও স্থান দেবনা, কিন্তু বড় বড় ভূস্বামীদের ক্ষেত্রে সেই পথই আমাদের নিতে হবে।

ছোট কৃষকদের সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য হল, প্রথমত, তাদের ব্যক্তিগত উৎপাদন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সমবায়ী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা, জবরদস্তি করে নয়, উদাহারণ দেখিয়ে, এবং এই উদ্দেশ্যে সামাজিক সাহায্যের প্রস্তাব করে। তখন নিশ্চয় ছোট কৃষককে তার ভবিষ্যত সুবিধা দেখিয়ে দেবার প্রচুর সুযোগ আমরা পাব, যে সুবিধা এমনকি আজই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠার কথা" [*ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস, পশ্চিমের কৃষক সমস্যা,* আলেক্সেয়েভার সংস্করণ, পৃ ১৭, রুশ অনুবাদে ভুলভ্রান্তি আছে। মুল লেখাটি আছে *নয়া সংবাদপত্র* (*নিউ জাইত*) পত্রিকায় (৩৬)]।

সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামের রণকৌশল

ব্যবহারিক বিপ্লবী কার্যকলাপের পরিস্থিতি আত্মস্থ করা ও গুরুত্ব বোঝার অক্ষমতাই যে আগেকার বস্তুবাদের একটি প্রধান ত্রুটি সেটা ১৮৪৪-১৮৪৫ সালেই উদ্ঘাঘাটিত করে মার্কস তাঁর তাত্ত্বিক কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে সর্বহারাশ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রামের রণকৌশলের প্রতিও সারা জীবন বিরামহীন মনোযোগ দিয়ে এসেছেন। এ বিষয়ে বিপূল উপাদান মার্কসের *সমস্ত* লেখাতেই পাওয়া যাবে, বিশেষ করে ১৯১৩ সালে চার খণ্ডে প্রকাশিত এঙ্গেলসের সঙ্গে তাঁর পত্রাবলীতে। এই সব মালমশলা এখনো পর্যন্ত সংগ্রহ, বিন্যাস, অধ্যয়ন ও পরীক্ষা করা হয় নি। এক্ষেত্রে তাই শুধু সবচেয়ে সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত মন্তব্যেই সীমাবদ্ধ থেকে কেবল এইটুকুর ওপর জোর দিতে চাই যে, বস্তুবাদের মধ্যে *এই* দিকটা না থাকলে মার্কস তাকে ন্যায্যতই গণ্য করতেন অসম্পূর্ণ, একতরফা ও নিষ্প্রাণ বলে। সর্বহারা রণকৌশলের মূল কর্তব্য মার্কস নির্ণয় করেছিলেন তাঁর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দ্বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীর সবকটি প্রতিজ্ঞার সাথে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে। কোন একটি সমাজের বিনা ব্যতিক্রমে সকল শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্কের যোগফলের বস্তুনিষ্ঠভাবে হিসাব এবং সুতরাং, সেই সমাজের বিকাশের বাস্তব পর্যায় এবং সেই সমাজের সঙ্গে অন্যান্য সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচারই অগ্রসর শ্রেণীর পক্ষে সঠিক রণকৌশল নির্ধারণের ভিত্তি হতে পারে।

তাতে সমস্ত শ্রেণী ও সকল দেশকে দেখতে হয় স্থিরভাবে নয় বরং গতিশীল অবস্থায় (প্রত্যেক শ্রেণীর অস্তিত্বের অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে তার নিয়মকানুনের উদ্ভব)। গতিকেও আবার দেখা হয় শুধু অতীতের দৃষ্টিকোন থেকে নয়, ভবিষ্যতের দৃষ্টিকোন থেকেও, সাথে সাথে তাকে বুঝতে হবে দ্বান্দ্বিকভাবে, যাঁরা শুধু ধীর পরিবর্তনটুকুই দেখেন সেইরূপ "বিবর্তনবাদীদের" স্থূল ধারণা অনুসারে নয়। এঙ্গেলসের কাছে মার্কস লিখেছিলেন, "বৃহৎ বৃহৎ ঐতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিশ বছর হয়ে দাঁড়ায় এমন মাত্রায় যে তা এক দিনের চেয়ে বড়, যদিও পরে এমন দিন আসতে পারে যখন তাঁর এক একটা দিনেই এঁটে যায় বিশ বছর" (*মার্কস-এঙ্গেলস পত্রাবলী, তৃতীয় খন্ড*)। বিকাশের প্রত্যেকটি পর্যায়ে, প্রত্যেকটি মুহূর্তে সর্বহারা রণকৌশলের পক্ষে উচিত মানবিক ইতিহাসের এই বস্তুগতভাবে অবশ্যম্ভাবী দ্বান্দ্বিকতার হিসাব করা; একদিকে রাজনৈতিক অচলাবস্থা বা মন্থরগতির তথাকথিত "শান্তিপূর্ণ" বিকাশের যুগকে ব্যবহার করে অগ্রসর শ্রেণীর শ্রেণী চেতনা, শক্তি ও সংগ্রাম ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলা আর অন্যদিকে ব্যবহার করার এই সবটুকু কাজকে পরিচালিত করা এই শ্রেণীর আন্দোলনের "চূড়ান্ত লক্ষ্যের" দিকে, যখন "এক একটা দিনের মধ্যেই বিশ বছর এঁটে যেতে থাকবে, সেই সব মহান দিবসের মহান কর্তব্যগুলির ব্যবহারিক সম্পাদনের মত দক্ষতা সৃষ্টি করার দিকে"। এই প্রসঙ্গে মার্কসের দুটি যুক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণঃ এর একটি আছে *দর্শনের দারিদ্র্য* গ্রন্থে, সর্বহারার অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক সংগঠন উপলক্ষ্যে, অন্যটি আছে '*সাম্যবাদী ইশতেহারে*', সর্বহারার রাজনৈতিক কর্তব্য প্রসঙ্গে। প্রথমটিতে বলা হয়েছেঃ "বৃহদাকার শিল্পের ফলে একজায়গায় পরস্পর অপরিচিত একগাদা লোক পুঞ্জীভূত হয়। প্রতিযোগিতা তাদের স্বার্থে স্বার্থে ভেদ ঘটায়। কিন্তু মজুরীর হার ঠিক রাখা—মালিকের বিরুদ্ধে তাদের এই সাধারণ স্বার্থ তাদের ঐক্যবদ্ধ করে তোলে একই সাধারণ প্রতিরোধ চিন্তায়—জোটবদ্ধতায়... প্রথমে ছাড়া ছাড়া ভাবে দেখা দেওয়া এই জোটবদ্ধতা রূপ নেয় দলবদ্ধতায়,

এবং অবিরাম ঐক্যবদ্ধ পুঁজির বিরুদ্ধে তাদের এই সমিতিকে বাঁচিয়ে রাখা মজুরদের পক্ষে এমনকি তাদের মজুরী রক্ষার চেয়েও বেশী জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। ...এই সংগ্রামের মধ্যে, খাঁটি এই গৃহযুদ্ধে, আসন্ন লড়াইয়ের সকল উপাদান ঐক্যবদ্ধ ও বিকশিত হয়ে উঠে। আর এই পর্যায়ে এসে জোটবদ্ধতা গ্রহণ করে রাজনৈতিক চরিত্র"। আগামী কয়েক দশকের জন্যে, আসন্ন লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে দীর্ঘতর সব যুগের জন্য অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কর্মসূচি ও রণকৌশলও এখানে পাওয়া যাবে যেখানে সর্বহারাশ্রেণী তার "আসন্ন যুদ্ধ"-এর শক্তি প্রস্তুত করবে।। বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের যেসব অসংখ্য দৃষ্টান্ত মার্কস ও এঙ্গেলস দিয়েছেন সেগুলিকেও এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবেঃ কেমন করে শিল্পজনিত "সমৃদ্ধির" ফলে চেষ্টা হয় "শ্রমিককে কিনে নেবার" (১৮৬৩ সালের ৯ এপ্রিল ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র, *মার্কস-এঙ্গেলস পত্রাবলী*, প্রথম খন্ড), সংগ্রাম থেকে তাদেরকে বিচ্যুত করার; কেমন করে এই সমৃদ্ধির ফলে সাধারণভাবে "শ্রমিকরা মনোবল হারায়" (*১৮৫৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের পত্র, মার্কস-এঙ্গেলস পত্রাবলী, দ্বিতীয় খন্ড*); কীভাবে বৃটিশ সর্বহারা অধিক থেকে অধিকতরভাবে "বুর্শোয়া বনে যায়" যাতে "সবার চেয়ে বুর্শোয়া এই জাতিটার" (বৃটিশ) "লক্ষ্য যেন পরিণামে বুর্শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে একট বুর্শোয়া অভিজাত শ্রেণী এবং বুর্শোয়া সর্বহারাও গড়ে তোলা" (*১৮৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের পত্র, মার্কস-এঙ্গেলস পত্রাবলী, দ্বিতীয় খন্ড*); কীভাবে এই বুর্শোয়াদের "বিপ্লবী তেজ" উবে যায় (১৮৬৩ সালের ৮ই এপ্রিল কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের পত্র, *মার্কস-এঙ্গেলস পত্রাবলী, তৃতীয় খণ্ড)*, তাদের "এই আপাত প্রতীয়মান বুর্শোয়া অধপতন থেকে মুক্তির জন্যে" ইংরেজ শ্রমিকদের এখনো মোটামুটি দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে হবে (১৮৬৩ সালের ৯ই এপ্রিল এঙ্গেলসের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র, *মার্কস-এঙ্গেলস পত্রাবলী, তৃতীয় খন্ড*)। বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে কেমন করে

"চার্টিস্টসুলভ তেজ রইলনা" (*১৮৬৬ সালের ২রা এপ্রিল ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র, মার্কস-এঙ্গেলস পত্রাবলী, তৃতীয় খন্ড*); কীভাবে বৃটিশ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ "রেডিক্যাল বুর্শোয়া ও শ্রমিকের" মাঝামাঝি একটা টাইপে পরিণত হচ্ছে (*হোলিওক প্রসঙ্গে, ১৮৬৯ সালের ১৯শে নভেম্বর কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের পত্র, মার্কস-এঙ্গেলস পত্রাবলী, চতুর্থ খন্ড*); কীভাবে বৃটিশ একচেটিয়া অধিকারের দরুন এবং যতদিন পর্যন্ত এই অধিকার না ভাঙছে ততদিন পর্যন্ত আর "বৃটিশ শ্রমিকদের দিয়ে কিছু হবেনা" (*১৮৮১ সালের ১১ই আগস্ট কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের পত্র, মার্কস-এঙ্গেলস পত্রাবলী, চতুর্থ খন্ড*)। শ্রমিক আন্দোলনের সাধারণ ধারা (ও পরিণতি) প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক সংগ্রামের রণকৌশলকে এখানে দেখা হয়েছে একটি চমৎকার সুদুরপ্রসারী, সামগ্রিক, দ্বান্দ্বিক এবং প্রকৃত বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে।

রাজনৈতিক সংগ্রামের রণকৌশল প্রসঙ্গে *সাম্যবাদী ইশতেহার* হাজির করেছে মার্কসবাদের মূল নীতিঃ "শ্রমিক শ্রেণীর আশু লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য সাম্যবাদীরা লড়াই করে থাকে; কিন্ত আন্দোলনের বর্তমানের মধ্যেও তারা আন্দোলনের ভবিষ্যতের প্রতিনিধি, তাঁর রক্ষক" (*কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস, সাম্যবাদী পার্টির ইশতেহার*)। সেইজন্যই ১৮৪৮ সালে মার্কস সমর্থন জানিয়েছিলেন পোল্যান্ডের "কৃষি বিপ্লবের" পার্টিকে, "সেই পার্টি যা ১৮৪৬ সালে ক্রাকোভে অভ্যুত্থানের ডাক দিয়েছিল" (*ক্রাকোভ প্রজাতন্ত্রের গণতান্ত্রিক জাতীয় মুক্তি অভ্যুত্থানের কথা বলা হচ্ছে। ১৮১৫ সালে এটি অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া ও রাশিয়ার সমবেত নিয়ন্ত্রণে আসে। অভ্যুত্থানীরা জাতীয় সরকার গঠন করে, সরকার সামন্ততান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা লোপ করার ইশতেহার ঘোষণা করে ও বিনা ক্ষতিপূরণে কৃষকদের মালিকানায় জমি তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। সেইসাথে, জাতীয় কর্মশালা স্থাপন, তাতে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি, নাগরিক সমতা ঘোষিত হয়। কিন্তু শীঘ্রই অভ্যুত্থান দমিত হয়*)।

জার্মানিতে ১৮৪৮-৪৯ সালে মার্কস চরমপন্থী বিপ্লবী গণতন্ত্রের সমর্থন করেছিলেন এবং রণকৌশল সম্পর্কে তখন যা বলেছিলেন কখনো তা পরে প্রত্যাহার করেননি। তাঁর দৃষ্টিতে জার্মান বুর্শোয়ারা হল এমন লোক যারা 'জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং পুরনো সমাজের রাজমুকুটধারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে আপোস করার জন্য একেবারে প্রথম থেকেই ঝুঁকেছে (কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মৈত্রীতেই কেবল বুর্শোয়াদের কর্তব্যের সামগ্রিক সাধন সম্ভব হতে পারত)। বুর্শোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে জার্মান বুর্শোয়াদের শ্রেণী অবস্থান সম্পর্কে মার্কস প্রদত্ত বিশ্লেষণের সারাংশ এখানে তুলে দেয়া গেল, প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এ বিশ্লেষণ হল সেই বস্তুবাদের একটি আদর্শ, যাতে সমাজকে গতির মধ্যে দেখা হয় এবং গতির শুধু পশ্চাদমুখী দিক থেকে নয়ঃ ... এর না আছে নিজের ওপর আস্থা, না আছে জনগণের উপর বিশ্বাস; উপরের বিরুদ্ধে অসন্তোষ, নিচের সামনে কাঁপুনি;... বিশ্ব ঝড়ে ভীত; কোন দিকেই উদ্যোগ নেই, আর সব দিকেই নকল করা; ... উদ্যমহীন; ... অভিশপ্ত এক বৃদ্ধ যার উপর পড়েছে একটা নবীন ও বলিষ্ঠ জাতির প্রথম যৌবন উদ্দীপনাকে নিজের জরাগ্রস্ত স্বার্থে চালিত করার দণ্ড'... (নতুন রাইন পত্রিকা ১৮৪৮; 'সাহিত্যিক উত্তরাধিকার', তৃতীয় খন্ড, কার্ল মার্কস, বুর্শোয়া ও প্রতিবিপ্লব)। প্রায় কুড়ি বছর পরে ১৮৫৬ সালের ১৬ই এপ্রিল এঙ্গেলসের নিকট পত্রে (*মার্কস-এঙ্গেলস পত্রাবলী, তৃতীয় খন্ড*) মার্কস ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার এই কারণ ঘোষণা করেন যে, স্রেফ মুক্তির জন্য সংগ্রামের একটা প্রত্যাশার চাইতে বুর্শোয়ারা দাসত্বসহ শান্তিই বাঞ্ছনীয় মনে করেছিল। ১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লবী যুগ যখন অবসান লাভ করল, তখন বিপ্লব নিয়ে খেলা করার প্রত্যেকটি প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছিলেন মার্কস (শাপার ও ভিলিখের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম) এবং আপাত "শান্তিপূর্ণ" নতুন যুগে নতুন বিপ্লবের প্রস্তুতি চালানোর জন্য কাজ করতে পারার জন্য জোর দেন। কীভাবে সে কাজ চালানোর দাবি মার্কস করেছিলেন তা দেখা যাবে ঘোরতর প্রতিক্রিয়ার কালে, ১৮৫৬ সালে জার্মানির অবস্থা সম্পর্কে তাঁর এই মূল্যায়নেঃ

"কৃষক যুদ্ধের দ্বিতীয় সংস্করণ দিয়ে সর্বহারা বিপ্লবকে সমর্থন করতে পারার সম্ভাবনার উপরই জার্মানির সমস্ত ব্যাপারটা নির্ভর করবে" (১৮৫৬ সালের ১৬ই এপ্রিল ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র, মার্কস-এঙ্গেলস পত্রাবলী', দ্বিতীয় খন্ড)। জার্মানীতে গণতান্ত্রিক (বুর্শোয়া) বিপ্লব সমাধা না হওয়া পর্যন্ত মার্কস সমাজতান্ত্রিক সর্বহারা রণকৌশলে সমস্ত মনোযোগ চালিত করেছিলেন কৃষক সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক উদ্যোগ বিকাশের দিকে। তাঁর মতে, লাসাল "প্রুশিয়ার স্বার্থে শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি কার্যক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা" করছিলেন (১৮৬৫ সালের ২৭শে জানুয়ারী কার্ল মার্কসের কাছ ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের পত্র, মার্কস-এঙ্গেলস পত্রাবলী, তৃতীয় খন্ড) প্রসঙ্গত তাঁর কারণ নিতান্ত এই যে, লাসাল জমিদার ও প্রুশীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি পক্ষপাত করেছিলেন। সংবাদপত্রে একটি যুক্ত বিবৃতি দেয়ার উদ্দেশ্যে এঙ্গেলস ১৮৬৫ সালে মার্কসের সঙ্গে মত বিনিময় করতে গিয়ে লিখেছিলেন, "কৃষিনির্ভর দেশে, সামন্ত অভিজাতদের 'চাবুকের তলায়' গ্রাম্য মজুরদের উপর পিতৃতান্ত্রিক শোষণের কথা ভুলে গিয়ে শিল্প শ্রমিকদের নামে শুধু বুর্শোয়াদেরই আক্রমণ করাটা অতি নীচ কাজ" (১৮৬৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের পত্র, মার্কস-এঙ্গেলস পত্রাবলী, তৃতীয় খন্ড)। ১৮৬৪-৭০ সালে যখন জার্মানীতে শেষ হয়ে আসছিল বুর্শোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ, যখন প্রুশিয়ার ও অস্ট্রিয়ার শোষক শ্রেণীগুলি কর্তৃক *উপর থেকে* যে কোন পন্থায় বিপ্লব সম্পূর্ণ করা জন্য সংগ্রামের যুগ, তখন মার্কস শুধু যে বিসমার্কের সঙ্গে দহরম মহরমকারী লাসালেরই নিন্দা করেন তাই নয়, লিবক্লেখতের ত্রুটিও সংশোধন করে দেন—যিনি 'অস্ট্রিয়াবাদ' ও স্বতন্ত্রবাদের সমর্থনে ঝুঁকেছিলেন। মার্কস দাবি করলেন এমন বিপ্লবী রণকৌশল যা বিসমার্ক ও অস্ট্রিয়াবাদী উভয়ের সঙ্গে সংগ্রামেই হবে সমান নির্মম, "বিজয়ী" প্রুশীয় জমিদারদের তোয়াজ করবেনা, বরং প্রুশীয় সামরিক জয়লাভের ফলে যে ভিত্তি তৈরি হল তাঁর উপরই দাঁড়িয়ে তাদের বিরুদ্ধেই অবিলম্বে নতুন করে বিপ্লবী সংগ্রাম শুরু করবে

(*কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের ১৮৬৩ সালের ১১ই জুন, ১৮৬৩ সালের ২৪শে নভেম্বর, ১৮৬৪ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৬৫ সালের ২৭শে জানুয়ারী, ১৮৬৭ সালের ২২শে অক্টোবর, ১৮৬৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখের পত্র এবং ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের কাছে কার্ল মার্কসের ১৮৬৩ সালের ১২ই জুন, ১৮৬৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর, ১৮৬৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী এবং ১৮৬৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বরের পত্র দ্রষ্টব্য, মার্কস-এঙ্গেলসপত্রাবলী, তৃতীয় খন্ড*)। আন্তর্জাতিকের ১৮৭০ সালের ৯ই সেপ্টেম্বরের বিখ্যাত অভিভাষণে অকাল অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে মার্কস ফরাসী সর্বহারাদের হুশিয়ার করে দিয়েছিলেন। তাসত্ত্বেও যখন অভ্যুত্থান ঘটে গেল (১৮৭১), তখন "স্বর্গ জয়ে অভিযানী" জনগণের বিপ্লবী উদ্যোগকে মার্কস সোৎসাহে অভিনন্দিত করেছিলেন (ল, কুগেলমানের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র, ১২ই এপ্রিল, ১৮৭১)। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতো এই ক্ষেত্রেও অধিকৃত অবস্থান ছেড়ে দেওয়ার চাইতে, বিনা যুদ্ধে আত্বসমর্পণের চাইতে যুদ্ধ চালিয়ে বিপ্লবী সংগ্রামের পরাজয় মার্কসীয় দ্বান্দিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সর্বহারা শ্রেণীর সংগ্রামের সাধারণ গতি ও পরিণতির পক্ষে ছিল কম ক্ষতিকর; লড়াই ছাড়া আত্মসমর্পণে সর্বহারাশ্রেণীর মনোবল ভেঙে যেত আর তার সংগ্রাম সামর্থ্য নষ্ট হয়ে যেত। রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও বুর্শোয়া বৈধতার প্রাধান্যের যুগে সংগ্রামের আইনসঙ্গত উপায়গুলির প্রয়োগের মুল্য মার্কস পুরোপুরি অনুভব করেছিলেন, এবং ১৮৭৭ ও ১৮৭৮ সালে সমাজতন্ত্র-বিরোধী জরুরী আইন পাশ হয়ে যাওয়ার পর (বিসমার্ক সমাজতন্ত্রবিরোধী জরুরী আইন জার্মানীতে পাশ করে ১৮৭৮ সালে শ্রমিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে। আইনে সমাজ গণতন্ত্রী পার্টির সমস্ত সংগঠন, গণ শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিক সংবাদপত্র নিষিদ্ধ হয়, বাজেয়াপ্ত হয় সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য। সমাজগণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয় দমন ব্যবস্থা ও নির্বাসন। ১৮৯০ সালে ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান শ্রমিক আন্দোলনের চাপে সমাজতন্ত্রীবিরোধী জরুরী আইন বাতিল হয়)

তিনি মস্ক-এর ‘বিপ্লবী বুলির’ তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু সমাজতন্ত্র-বিরোধী আইনের জবাবে যখন আনুষ্ঠানিক সমাজ গণতন্ত্রী পার্টি থেকে তৎক্ষণাৎ অবিচলতা, দৃঢ়তা, বিপ্লবী প্রেরণা ও বে-আইনী সংগ্রাম গ্রহণের মতো তৎপরতা দেখা গেল না, তখন এই পার্টির মধ্যে যে সুবিধাবাদ সাময়িকভাবে মাথা তুলেছিল তাকেও মার্কস যে ভাবে আক্রমণ করেছিলেন সেটা বেশি না হলেও কম তীব্র ছিল না (ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের কাছে কার্ল মার্কসের ১৮৭৭ সালের ২৩শে জুলাই, ১৮৭৭ সালের ১লা আগস্ট ও ১৮৭৯ সালের ১০ই সেপ্টেম্বরের পত্র এবং কার্ল মার্কসের নিকট ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের ১৮৭৯ সালের ২০শে আগষ্ট ও ১৮৭৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বরের পত্র দ্রষ্টব্য। মার্কস-এঙ্গেলস পত্রাবলী, চতুর্থ খণ্ড। সরগের কাছে লেখা চিঠিগুলিও দ্রষ্টব্য)।।